পঞ্চম সংখ্যাঃ শ্রাবণ/ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ; অগাষ্ট/২০২৩ ইং

ত্রৈমাসিক সাহিত্য ই-পত্রিকা

https//www.facebook.com/ShadwalMagazine

সম্পাদকঃ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদঃ শামসুল হক আজাদ

'শাদ্বল' সাহিত্য ই-পত্রিকা

পঞ্চম সংখ্যাঃ শ্রাবণ/ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ; অগাষ্ট/২০২৩ ইং

www.facebook.com/ShadwalMagazine

সম্পাদকঃ

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদঃ

শামসুল হক আজাদ

টাইপ সেটিং ও মূদ্রণঃ

সম্পাদক/ শাদ্বল

ঠিকানাঃ

খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার সদর

জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭

শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

সূচিপত্র

'শাদ্বল' সাহিত্য ই-পত্রিকাঃ পঞ্চম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

কবিতা নিয়ে কিছু ভাবনা

‘সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।’

কবিগুরু একথা সেকালেই বলেছেন তাঁর ‘ঐক্যতান’ কবিতায়। বলেছেন অবশ্য গজদন্ত মিনারে বসে শুধুমাত্র আকাশ, বাতাস, রাঙা মেঘের সৌন্দর্য প্রকাশের সাধনায় নিমগ্ন কবি-সাহিত্যিকের প্রতি সমালোচনার তির উঁচিয়েই। ‘যে আছে মাটির কাছাকাছি,/ সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি’- একই কবিতার কয়েক পঙতি আগের পঙতি, যেখানে তিনি শিল্প-সাহিত্যকে মানুষের বাস্তবিক সমস্যার মাটিতে নেমে আসবার কথা বলেছেন। এই সম্পাদকীয়র মূল উদ্দেশ্য অবশ্য সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে শিল্প সাহিত্যের আলোচনা নয়। কবিগুরুর কবিতার পঙতিটির পটভূমি ব্যাখ্যা করতেই এই আলোচনা। আমি এই পটভূমি ছেড়ে কবিগুরুর পঙতির ‘সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি’ এই বিষয়েরই অপর একটি দিকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। উদ্দেশ্য হল, সত্য মূল্য না দিয়ে শিল্প-সাহিত্য হলে তা কতটা মহৎ ও গঠনশীল শিল্প-সাহিত্য হয় তা একটু ছোট্ট করে বলা মাত্র। ‘নান্দনিকতাই (aesthetics)’- সমস্ত চারুকলারই (fine arts) মর্মের কথা- সে হিসেবে সাহিত্যেরও। সাহিত্যের মাধ্যম কথ্য ও লিখিত ভাষা; ভাষা আবার শব্দের অর্থময় সুবিন্যাসে ভাবের প্রকাশ। চিত্রশিল্প, ধ্রুপদ সঙ্গীত, ও যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি নান্দনিক যে কোনো শিল্পেরই নিজস্ব একটি প্রকাশ মাধ্যম থাকে, অ্যারিস্টটল যাকে মিডিয়াম বলেছেন। এই প্রকাশ মাধ্যমটিই তার ভাষা। যেমন চিত্র শিল্পের ভাষা শিল্পীর তুলির টান বা পেন্সিলের গাঢ়, হালকা নানা দাগ ও নানা রঙের খেলা। যে কোনো সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীতের ভাষা তার সুর-ছন্দ-লয় (‘harmony and rhythm’- Aristotle)। সেরকমই সাহিত্যের মাধ্যম আমাদের কথ্য ও লিখিত ভাষা। একটি আর্ট

গ্যালারিতে বিমূর্ত রীতির (Abstruct art) একটি চিত্রকলার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি- হয়তো চিত্রকলাটির সম্পূর্ণ অর্থ বুঝি না- যেন 'কিছু তার দেখি আভা। কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা'। কিন্তু সামগ্রিক চিত্রকলাটি আমাদের মুগ্ধ করে, আমরা এক অবাক আনন্দ উপলব্ধি করি। সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীত শুনতে শুনতে সুরের মূর্ছনায় আবিষ্ট হই। সুরই এখানে বড় কথা- সুরের ওঠা-পড়ার ভাবই শ্রোতার মনে আনন্দ বিস্ময় ও মুগ্ধতা বয়ে আনে। ধ্রুপদী কণ্ঠসঙ্গীতে 'তারানা'র বিশেষ অর্থ থাকে না; জাপানি ভাষা জানি না, কিন্তু জাপানি গানও অনেকে আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি; আর সিংহলি গান 'মানিকে মাগে হিতে'র মানে বুঝবার আগেই সারা ভারত তাতে মগ্ন হয়েছে। আমার প্রতিপাদ্য এই যে চিত্রকলা শিল্পীর তুলির টানে, গাঢ়-হালকা, স্থূল-সূক্ষ্ম রেখা ও রঙের শিল্পানুগ ব্যবহারে চমৎকৃত করে দর্শককে মুগ্ধ, ভাবাবিষ্ট, আনন্দিত করতে পারলেই শিল্প হিসেবে সার্থক। এর অতিরিক্ত, যে অভ্যন্তরীণ অর্থ তার প্রকাশ করা অভিপ্রেত তা যদি সেই চিত্রশিল্প পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় তবে তো কথাই নেই। সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত সুরের মূর্ছনায় আমাদের ছন্দিত, আবিষ্ট , আনন্দিত করতে পারলেই শিল্প হিসেবে সার্থক। সঙ্গীতের কথা যদি সুন্দর ও অর্থবহ হয়, ও শ্রোতা তা বুঝতে পারে তবে তার আবেদন বেড়ে যায় বইকি? অর্থাৎ শিল্পকর্মটির বোধগম্য অর্থময়তা শিল্পকর্মটিকে আরও জনপ্রিয় ও সার্থক করে। "Music causes freedom, and this freedom is expressed in dance"- সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত আমাদের মনে ও শরীরে যে ছন্দের (rhythm) লহরী তোলে তাইই প্রকাশিত নৃত্যে। কিন্তু সাহিত্যে?

সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা; ভাষা অর্থময় শব্দের অর্থপূর্ণ সুশৃঙ্খল ব্যবহার (বাংলা ব্যাকরণ তাই বাক্যের আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্খা এই তিন বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছে।)। শব্দ অর্থময়; বাক্য অর্থময়; ভাষা অর্থময়। অর্থহীন বাক্য ও ভাষা প্রগল্ভতা। তাই অর্থময় ভাষাই হল সাহিত্যের মাধ্যম; তাই সাহিত্যে অর্থের স্থান সর্বাগ্রে। অর্থহীন শব্দ সম্ভারের উপর আমরা সাহিত্যশিল্পের নানা নক্সা, অলংকার পরাতে পারি;

কিন্তু তা মাকাল ফলের থেকে বেশি কিছু হবে না। এই অর্থহীনের উপর রং-চং মারা মাকাল কাব্য-সাহিত্য আজকাল প্রায়ই চোখে পড়ে। প্রবন্ধে এই সুযোগ একদমই নেই। অন্যান্য গদ্য সাহিত্যেও অর্থহীনতা, দুর্বোধ্যতা, অবোধ্যতা (পাঠকগণ যদি শব্দটি ব্যবহারের অনুমতি দেন), কোনো স্থান নেই। তাহলে কবিতায় কি আছে? স্পষ্ট উত্তর 'না, নেই'?

তাহলে এত শত কবিতা এরকম মাকাল হয় কী করে! অবজেকটিভ রিয়ালিটির মাত্র বর্ণনামূলক কবিতার দিন শেষ হয়েছে কত শত বছর আগেই। ইংরেজি সাহিত্যের কথা বললে 'Age of Sensibility' ও তার ঠিক পরবর্তী ' Age of Romanticism in English Poetry'-এর অনেক অনেক আগে থেকেই কবিতা সাবজেকটিভ বা ব্যক্তিঅনুভূতির প্রকাশ। 'Realist' কাব্য-সাহিত্য আন্দোলন কবিতা এমনকি সার্বিকভাবে সাহিত্যে এই সাবজেকটিভিটিতে একদমই রাশ টানতে পারেনি। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগে সাহিত্যে সাবজেকটিভিটির পালে যে দমকা বাতাস আসে তা সুররিয়ালিজমে (surealism) আদ্রিত হয়ে বেগবতী হয়ে অবচেতন মনের সাহিত্য আন্দোলনের যুগ মহাসমারোহে পার করে ডিকন্সট্রাকশনের যুগকেও অতিক্রম করে ছুটে চলেছে নিত্যনতুন গতিময়তায়। শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞানের পৃথিবীতে এই স্বাভাবিক ও অভিপ্রেত। অন্বেষণ চলছে অবিরাম নিত্যনতুন ব্যক্তি-অনুভূতির, তা প্রকাশে নিত্যনতুন উপমার, নিত্যনতুন শব্দ চয়নের, নিত্যনতুন গঠনশৈলী, প্রকাশভঙ্গির যার সুফল ও কুফল দুইই আমাদের পাতে। সুফলটি হল অনেক অনেক নিত্যনতুন সফল কবিতা যা আমাদেরকে চমৎকৃত করে, কবিতাকে ভালো বাসায়, আর কুফলটি হল অন্ধের হস্তী দর্শনের মতো মাকাল কবিতার জন্মদান যা হাসায়। 'Dadaism'-এর অন্যতম প্রচারক Tristan Tzara ১৯২০ সালে প্রস্তাব করেন যে একটি খবরের কাগজের যে কোনো একটি লেখার শব্দগুলোকে কেটে মিশিয়ে ফেলে সেগুলো থেকে নির্বিচারে পর পর শব্দ তুলে পাশাপাশি বসিয়েও কবিতা তৈরি করা যেতে পারে। (যা হোক, 'ডাডাইজম' অনেকাংশে ধ্বংসাত্মক হলেও পরবর্তীতে সুররিয়ালিস্টিক সাহিত্যকে উদ্রিক্ত করেছিল

যে সুররিয়ালিজমের প্রভাব সাহিত্যে অপরিসীম।) আজকের অনেক অনেক কবিতায় আমরা পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন শুধুমাত্র অনেকগুলো খন্ডচিত্র (separate images) পাই, কিন্তু এই খন্ডচিত্রগুলোর সমন্বয়ে কোনো একক সামগ্রিক চিত্র পাই না (Heterogeneous unconnected images can not form an imagery)। ফলে কবিতাটির সামগ্রিক কোন অর্থ হয় না। এ ডাডাইজমের তুলনায় কম কীসে! এজাতীয় কবিতার সপক্ষে যুক্তিও আছে। তারা শিল্প সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের উক্তিকেই নিজের স্বপক্ষে ব্যবহার করেন- "Art is the imitation of life" (শিল্প জীবনেরই অনুকরণ)। তাদের প্রশ্ন, জীবনেরই কি প্রকৃত কোনো অর্থ আছে? এ জীবন কি সাজানো গোছানো? জীবন তো খন্ডাংশ মাত্র- আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাও তো জীবনের নানা খন্ড খন্ড ঘটনার ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে প্রভাব ও অনুভূতি থেকে জাত। জীবনই খন্ড-বিখন্ড, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন- 'fragmented and shattered without definite meaning'। আমি এই মুহূর্তে যা, পরমুহূর্তে হয়তো তা নই। জীবনের কোনও পূর্ণ চিত্র হয়? এলিয়ট তাঁর 'The Hollow Men' কবিতায় আমাদের অন্তঃসারশূন্য আধুনিক জীবনকে বেশ বলেছেন:

"Shape without form, Shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;"

এই একই কবিতায় এলিয়ট আরও লিখেছেন:

"Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom

Between the conception

And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow
Life is very long

Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom"

সুতরাং আমাদের জীবনই যেহেতু এরকম ভগ্ন, অন্তঃসারশূন্য, যেখানে ধারণা ও বাস্তবতা, অনুভূতি ও সৃষ্টি, আমাদের আবেগ ও প্রতিক্রিয়া, আমাদের চাওয়া ও হওয়ার মাঝখানে গভীরতর ছায়া; যেখানে এরকমই অস্তিত্বের সংকট, বেমিলের পৃথিবী, সেখানে জীবনের অনুকরণ হিসেবে যে কোন শিল্প এমনকি কবিতা যা সৃষ্টি করবে তাও তো এই জীবনের মতোই অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য বেমিলের কারবার হবে তা বলাই বাহুল্য। তাই 'imitation of life' হিসেবেই কবিতায় অর্থের পূর্ণতা নেই, কবিতায় ব্যবহৃত খন্ড চিত্রগুলোর মধ্যে কোনও সংহতি নেই, কী বলতে গেলাম ও কী বললাম তারও ঠিক নেই। অকাট্য যুক্তি। বেশ। তবু একটি কথা মনে রাখার। আর তা হল এই যে শিল্প সুন্দর (beautiful)। আর সুন্দর কী? সেই আদ্দি কালেই সক্রেটিস একটি শাশ্বত কথা বলেছেন: "If measure and symmetry are absent from any composition in any degree, ruin awaits both the ingredients and the composition...

Measure and symmetry are beauty and virtue the world over"- Socrates.।
এই বিখ্যাত দার্শনিকের কাছে সাযুজ্যময়তার মধ্যেই সৌন্দর্য। এই সাযুজ্য শব্দে-অর্থে-সুরে-ইমেজে-ইমেজারিতে হলে তবেই না সৌন্দর্য। মূলগতভাবে কবিতা অবশ্যই অনুভূতি নির্ভর; এই অনুভুতি ভাষায় এমন শৈল্পিকভাবে প্রকাশিত হয় যে তা পাঠককে মুগ্ধ করে, করে আনন্দিত। অ্যারিস্টটল এই আনন্দকে ' elevated pleasure' বলেছেন। আজকের শিল্প ও সে হিসেবে আজকের কবিতা অ্যারিস্টটলের সময়ের থেকে অনেক পরের কাহিনি। প্লেটো-অ্যারিস্টটল-সক্রেটিস ও আজকের কবিতা- এই দুয়ের মাঝখানে প্রবাহিত হয়েছে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে অনেকগুলো আন্দোলন যার প্রভাব নানাভাবেই আজকের কবিতাতেও থাকবে তাই স্বাভাবিক ও অভিপ্রেত। কোনও একটি নির্দিষ্ট কবিতার ধাঁচই কবিতা একথা বলা আর শিল্পীর মুক্ত চিন্তাকে অকাতরে হনন করা- দুইই এক। তাই আজকের শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের কোনও 'pivotal centre' নেই। 'The Second Coming' কবিতায় অন্য আঙ্গিকে ব্যবহৃত কবি ইয়েটসের (W. B. Yeats) দুটি পঙতিকে শিল্প-সাহিত্যে বর্তমান চলনের আঙ্গিকে সার্বিকভাবে ব্যবহার করা যায়:

"Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;"

শুধু ফ্যালকন কেনো, আমরাও বোধ হয় কেউই কারও কথা শুনছি না।

এখনকার এই বিক্ষিপ্ত ও আরেক অর্থে বহুমুখী শিল্প সাহিত্য আন্দোলনের মূল কোনো কেন্দ্রক নেই। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিল্প-সাহিত্য আন্দোলন। তা হোক, তাতে আমরা বহু ধরন ও প্রকরণ পাব।
এবার মূল কথায় ফিরি। কবিতায় 'unity of thought' অথবা ' unity of all parts in a poem' আদতেই কি জরুরী? কথ্য ও লিখিত ভাষায় 'শব্দ' অর্থময়; অর্থময় শব্দের সুশৃঙ্খল ব্যবহারে ভাষা অর্থময়; ভাষা সাহিত্যের

মাধ্যম; সেই কারণে কবিতারও। যে শিল্পকর্মের মাধ্যমেরই (medium) বৈশিষ্ট আর্থময়তা, সেই অর্থময় মাধ্যমকে আশ্রয় করে যে শিল্পকর্ম তা যদি অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য হয় তবে সেই শিল্পকর্মে সেই মাধ্যম বা ভাষা পরাজিত। সেই মাধ্যম বা ভাষা অর্থহীন এই শিল্পকর্মটিতে যেন ডনকুইজোটের মতো হাত-পা ছুঁড়ে বাতাসের সঙ্গে নিরর্থক যুদ্ধ করছে। এতে আসলেই সেই শিল্পের পরাজয়। এবার কবিতায় 'unity of thought' 'unity of all parts' বিষয়ে আসি। 'unity of thought' ও 'unity of all parts' গদ্য সাহিত্যে একান্ত অপরিহার্য। প্রবন্ধে এই 'unity of thought' কঠোরভাবেই মানতে হয়। তাহলে কবিতায়? কবিতাতো নানা আঙ্গিকে, নানা প্রতীকে, রূপকে, অ্যালুশানে, নানা অলংকারে কবির ব্যক্তি অনুভূতিকে প্রকাশ করে (যদিও গদ্যও অনেক ক্ষেত্রেই তা করে কাব্যিক হয়ে ওঠে)। কবিতার আড়াল-আবডাল অনেক বেশি, কবিতা তাই নানা ছদ্মবেশও গ্রহণ করে, ঈঙ্গিতে নানা ভাব প্রকাশ করে। এতে 'unity of thought' ও 'unity of all parts'-এর প্রশ্ন আসে কী করে? খুবই আসে। অর্থময় ভাষাকে মাধ্যম করে যে শিল্প তার অর্থয়তাকে বজায় রাখার জন্যেই উপরোক্ত দুই 'unity' খুব জরুরি। শুধুমাত্র খাপছাড়া ইমেজ ছড়িয়ে দিলাম কবিতা জুড়ে, সেগুলো কবিতাটির কোনও এক মাত্রিক বা বহু মাত্রিক লক্ষ্য বা ইঙ্গিতের প্রতি ধাবিত হল না, তা হলে পাঠক সেগুলো হাতড়িয়ে মরবে, আর কবিতাটি হবে প্রগল্ভ, শব্দ-ভাষা-ছবির অর্থহীন এমনকি কোনো ইঙ্গিতহীন প্রলাপ মাত্র, যা শিল্পের মূল উদ্দেশ্য যে 'আনন্দ দেওয়া' তা দিতে ব্যর্থ হবে।

উপরের আলোচনা এখানেই শেষ করে অন্য কথা বলি একটু। আর তা হল, বিশেষ কারণ বশত: শাদ্বলের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশে বেশ কিছুটা বিলম্ব হল। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লেখকের লেখার পাশাপাশি নবীন লেখকদের কিছু সংখ্যক লেখা এবারও এই সংখ্যায় রাখা হল উদীয়মান লেখকদের আরও লেখার প্রেরণা দেওয়ার জন্য। তবে জানিয়ে রাখি পরের সংখ্যায় লেখা নির্বাচনে একটু কঠোরতা অবলম্বন করা হবে।

বরাবরের মতো মন দিয়ে সংখ্যাটি সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছি, জানি ভুল-ত্রুটি আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মার্জনা করবেন।

শুভেচ্ছান্তে,
নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক
'শাদ্বল' সাহিত্য ই-পত্রিকা

বিদ্রঃ এখন থেকে 'শাদ্বলে'র মূল সংখ্যাটিকে দ্বিমাসিক থেকে ত্রৈমাসিক করা হলো।

শাদ্বল পত্রিকা সংবাদ

'শাদ্বল' সাহিত্য ই-পত্রিকার বাৎসরিক সাহিত্য উৎসব 'শাদ্বল বৃহত্তর কবিতা উৎসব-২০২৩' গত ৭ এপ্রিল, ২০২৩ কোচবিহার সাগর দিঘির পশ্চিম পাড়ে 'ল্যান্সডাউন' হলে সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার বিভিন্ন স্থানের আমন্ত্রিত বিশিষ্ট সাহিত্যসাধকবৃন্দ ও 'শাদ্বল' সাহিত্য ই-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যসাধকবৃন্দ। কোচবিহার থেকে প্রকাশিত ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরভূমিকা' দীর্ঘদিন যাবৎ সফলভাবে সম্পাদনার জন্য 'শাদ্বল' সাহিত্য ই-পত্রিকার তরফে 'শাদ্বল ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্মান-২০২৩' প্রদান করে সম্মানিত করা হয় সাহিত্যসাধক গৌরাঙ্গ সিনহা মহাশয়কে। সেই সঙ্গে 'শাদ্বল সাহিত্য সম্মান-২০২৩' প্রদান করে সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট কবি শুভাশিস চৌধুরী মহাশয়কে তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যকৃতির জন্য। সেই সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে দুটি সংক্ষিপ্ত সাহিত্যালোচনা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। 'আজকের কবিতার অভিমুখের সন্ধান' বিষয়ে আলোচনা করেন কবি ও প্রাবন্ধিক নীলাঞ্জন কুমার ও 'সাহিত্যের মহীরুহের শেকড় ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার জমিনে' বিষয়ক আলোচনাটি দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেন কবি দেবব্রত ভট্টাচার্য্য। সেই সঙ্গে এই আনুষ্ঠানে আমরা প্রায় ১১৫ জন বিদগ্ধ কবির স্বরচিত কবিতা পাঠ মুগ্ধ হয়ে শুনি। আনুষ্ঠানটির সার্থক সঞ্চালনা করেন কবি গৌতমী ভট্টাচার্য্য, কবি অশোক কুমার ঠাকুর ও কিছু অংশ পত্রিকা সম্পাদক নিজে। অনুষ্ঠানটিকে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করতে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন অনুষ্ঠান কমিটির সভাপতি কাবি আব্দুল মতিন আমেদ, ও অনুষ্ঠান কমিটির সদস্য কবি গৌরাঙ্গ সিনহা, কবি অশোক কুমার ঠাকুর, কবি উৎপলেন্দু পাল, কবি বিকাশ চক্রবর্তী, কবি বিদ্যুৎ সরকার, কবি হাবিবুর রহমান প্রমুখ ও সর্বোপরি 'শাদ্বল পত্রিকা পরিবারের' সকল সদস্যবৃন্দ।

প্রতিবেদক
সম্পাদক
শাদ্বল সাহিত্য ই-পত্রিকা

শাদ্বল বৃহত্তর কবিতা উৎসব- ২০২৩
শাদ্বল
ত্রিমাসিক সাহিত্য ই-পত্রিকা
shadwalpatrika@yahoo.com

শাদ্বল

শাদ্বল কবিতা উৎসব- ২০২৩ এর কিছু ঝলক

'শাদ্বল' ই-পত্রিকার ত্রিমাসিক সংখ্যায় লেখা দেওয়ার ঠিকানা ও নিয়মঃ

১. যে কোনো ছোটো দৈর্ঘ্যের লেখা লেখককে প্রথমে 'M.S. Word' এ লিখতে হবে। তারপর তা "DOCX" ফাইল হিসাবে পাঠাতে হবে। "PDF" হিসাবে নয়। বিকল্প হিসাবে নোট প্যাডে লিখে কপি পেস্ট করে পাঠাতে পারেন। ই-মেল বডি বা হোয়াটসঅ্যাপ বডিতে লিখে পাঠানো যাবে। সব থেকে ভালো 'M.S. Word' "DOCX" ফাইল হিসেবে পাঠানো।

2. লেখার স্ক্রিনশট ও ছবি গ্রহণ করা হয় না।

৩. পাঠাবেন এই ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেঃ

(ক) শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭

(খ) শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

শাদ্বলের প্রতিদিনের পাতায় লেখা পাঠানোর নিয়মঃ

'শাদ্বলে'র প্রতিদিনের পাতায় প্রতিদিন একটি করে কবিতা প্রকাশিত হয় 'শাদ্বল পত্রিকা – Shadwal Magazine' নামক ফেসবুক পেজ ও 'শাদ্বল পত্রিকা পরিবার' নামক ফেসবুক গ্রুপে, এবং 'শাদ্বল পত্রিকা পরিবার' নামক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ও সম্পাদকের নিজস্ব ফেসবুক ওয়ালে। 'Nilanjan Kumar Fan Club' নামক ফেসবুক গ্রুপেও তা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়।

আপনাদের ১৬ লাইনের মধ্যে অপ্রকাশিত কবিতা এখানে পাঠান।

কবিতা পাঠানোর নিয়মঃ

১. কবিতা পাঠাতে হবে ১৬ লাইনের মধ্যে **সম্পাদকের ফেসবুক মেসেঞ্জারে (Facebook Profile Name: 'Nripen Bhattacharya') অথবা 'শাদ্বল' পত্রিকার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর +৯১ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭-তে** মেসেজ বডিতে লিখে বা মূল লেখা থেকে কপি>পেস্ট করে।

৩. উপরে লিখবেন **'শাদ্বলের প্রতিদিনের পাতার জন্য'**। তার নিচে কবিতার নাম ও তার নিচে কবির নাম। 'কলমে অমুক' লিখবেন না। তার নিচে @ চিহ্ন দিয়ে লিখবেন আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর।

৪. **প্রতিদিনের পাতায় লেখা দিলে আপনাকে 'শাদ্বল' ই-পত্রিকার হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে ও 'শাদ্বল পাত্রিকা পরিবারে'র সদস্য করা হবে** যাতে আপনি প্রতিদিনের পাতাটি সহজে পান। আপনি অবশ্যই শাদ্বলের পেজে যোগ দেবেন ও সম্পাদককে ফ্রেন্ড রিকয়েস্ট পাঠাবেন যাতে আপনি পত্রিকার সব আপডেট পান।

৫. লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। **এক মাসের মধ্যে আপনার পাঠানো কবিতাটি শাদ্বলে প্রকাশিত না হলে তা অন্যত্র পাঠাতে পারেন**

৬. লেখা টাইপ করার সময় এন্টার মেরে পরের লাইনে আসতে হবে, স্পেস দিতে দিতে পরের লাইনে আসা যাবে না।

৭. প্রতিটি শব্দের মাঝে একটি করে স্পেস দিতে হবে, দু'টো নয়।

৮. 'টি, টা, খানা, খানি, ই, গুলো, গুলি'- ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশকগুলি নির্দিষ্ট শব্দের সাথেই বসবে। স্পেস দেবেন না।

৯. যে শব্দটির পরে ছেদ-যতি চিহ্ন বসবে, সে শব্দটির গা ঘেঁষে তা বসবে। শব্দের পরে যতি চিহ্ন বসানোর সময় কোনো স্পেস থাকে না।

শূন্য

হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটিই রাস্তা আর সেই পথে হেঁটে চলেছে
রোগা মোটা লম্বা চওড়া বেশ কিছু সংখ্যা
দূর থেকে তাদের শুধু চাবির শরীর
আসলে সংখ্যাগুলোর সঙ্গে
এত এত মানুষের শরীর লেপটে আছে
দেখা যাচ্ছে সংখ্যার শুধু মাথা
আর সেগুলো দেখাচ্ছে এক একটা ফাঁদের মতো
পাশ দিয়ে, ধার দিয়ে নয়
সবাই ওপর থেকে সংখ্যা তুলে নিতে চাইছে

আমরা এতদিন যারা স্বপ্নে পাহাড়ের গান শুনেছি
তাদের কোনো সংখ্যা নেই
বেশ কিছু জায়গায় তারা শুধু দাঁড়ায় আর
ভূমিকা করে যায় আগামী সভ্যতার
তাদের হাতের মুদ্রায় বুঝতে পারি একটা বড় শূন্য
ঘিরে দাঁড়ালেই তারা সামনের দিকে
এমনভাবে এগিয়ে যায় মনে হয়
সংখ্যা বলতে একমাত্র শূন্য।

শীতার্ত হতে নেই

শামসুল হক আজাদ

কোনো এক শীতে সাইকেলের কিড়িং বাজিয়ে বাবা ফিরে আসছে-কুয়াশা সরিয়ে। আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আলো মাখছি উদোম গায়ে। বাবা বলতেন, 'শীতার্ত হতে নেই'। তারপর ফকির চাচার আদুল গা বেয়ে গড়িয়ে আসা ঘামের ফোঁটা দেখিয়ে বলতেন: 'দ্যাখ খোকা, কেমন ভাপ উঠছে মাটির শরীর থেকে'। 'কোদাল চালা', 'কোদাল চালা', 'খুঁড়ে ফেল', 'খুঁড়ে ফেল',। 'শিকড়ের জন্য খোঁড়', 'বীজের আশ্রয়ের জন্য খোঁড়', 'খুঁড়তে থাক'। 'দেখবি শীত ব'লে কিছু নেই'।

চারিদিকে গমখেতের গা-বেয়ে নেমে আসছে নতুন-বৌয়ের মত আলো। সর্ষে ফুলের গন্ধে মাতাল মধুকর বাতাসের ঝুঁটি ধরে উড়ে যাচ্ছে কুঁড়ি থেকে কুসুমে।
আকাশমুখী ঘাসের ঠোঁটে এক বিন্দু শিশিরে লেখা হচ্ছে- প্রভাকরের আগমন।

ইহলোকের ওপার থেকে আজও যেন বাবা বলছেন-'জীবনের ভাসমান পাটাতনে দাঁড়িয়ে কেউ স্লিপার খুলে সেতু ভাঙছে, তোর কাজ জুড়ে যাওয়া, শুধু জুড়ে যাওয়া, যতদিন না শীতের কামড়ে হৃদয় অচেতন হয়'।

প্রবাহ

অপূর্ব কুমার চক্রবর্তী

গড়ানো ঢালে শুয়েছিল সবুজ শৈশবে
সারাদিন শুনতো স্রোতের গান রোদের উঠোনে
বাতাসের এস্রাজ-সঙ্গতে, নিয়ম মেনে
সকালের ইষ্টিকুটুম উড়ে যায়

রাত জলে ভেঙে চুরমার হয়
তারাদের আত্মকথা

স্বভাবতই স্রোত কারও গল্প
গচ্ছিত রাখেনি
রাখেনি কারও স্বপ্নের হেফাজত

যতবার নতুন জামা গায়ে হেঁটেছে দিবাকর
গোধুলি তাকেই হাত ধরে নিয়ে গেছে
চরিত্রহীন রাতের কুঠুরিতে

বিশ্বাসের এনসাইক্লোপিডিয়া জানিয়েছে,
যতই সাজাও ড্রইংরুম,
রাখো নতুন ফুল ফুলদানিতে
স্মৃতি ছাড়া সব ভেসে যায় প্রবাহে।

শুভাশিস চৌধুরীর দুটি কবিতাঃ

১.

একথা বলবো কবে ?

মৌমাছি হয়ে
শুধু ফুল মধু ছুঁয়ে বসে নেই-

মাছি হয়ে কর্দমা ঘাঁটি-
মধুতে অরুচি নেই,
মলমূত্রে তবু বেশি রুচি।

যেহেতু হইনি নদী,
বদ্ধজলা নর্দমা আমি।

২.

রূপরীতি

যাদের যাপনরীতি
নির্দ্বিধ রুচিতে দোরোখা,
তাদেরই চক্রান্তে রোজ
ভগবান হয়ে যান ভূত!
সজ্জন বোকা!

স্বপিণ্ড

পাপড়ি গুহ নিয়োগী

জারজ জীবন কাটাতে কাটাতে
বহুদিন একা পড়ে আছে ঘুম

গোটা একটা জীবন
গণতন্ত্র বানান লিখতে পারিনি

চুপচাপ
নিজের শ্রাদ্ধে নিজেই খেয়ে গেলাম

কে জন্ম দেয় আমাদের?

পিণ্ডদানে মুক্তি হয় না আত্মার

নষ্ট মেয়ের জন্য

শৈবাল মজুমদার

একটা মেয়ে ভরদুপুরে
আমার বুকে বিষের দাঁতে কামড়ে ছিল কামড়ে ছিল
দাঁতের সে দাগ আজও আছে, তেমনি আছে যেমন ছিল
একটা মেয়ে চিলেকোঠায় আমার বুকে কামড়েছিল
সেই মেয়েটি কোথায় থাকে কেউ জানেনা কেউ জানেনা
ভুল পুরুষের রুক্ষ ডানহাত
মুঠোয় ভরে পালিয়েছিল মধ্যরাতে পালিয়েছিল
সেই মেয়েটি কোথায় আছে কেমন আছে কেউ জানেনা
দাঁতের দাগে হাত বুলিয়ে রাত্রিজুড়ে ভ্রান্তশোকে
আমার শুধু ঘুম আসেনা ঘুম আসেনা

খোয়াবনামা

আসিফ আলতাফ

কিছু কিছু স্বপ্ন আছে আধুনিক নারী
বাঁশির সুরের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে
একতারার তারে বাঁধে ঘর!
কিছু স্বপ্ন আছে লেবু পাতার মতো
যার নীরব নবীন ঘ্রাণ,
আঙুলের ভালোবাসা পেলে
তবেই তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে;
শাওয়ারের জলের মতন
গুচ্ছ গুচ্ছ স্বপ্ন এনে দেয় স্নানের সুখ;
বৃদ্ধের ভাঙা হাসির মতন কিছু কিছু স্বপ্ন
কেবলই হৃদয় ভাঙে; কিছু স্বপ্নকুচি
কাচের মতই কাটে; রক্তাক্ত করে,
কপর্দকহীন কবির মতো কিছু কিছু স্বপ্ন
সংসার সাগরে ডুবে হয় সলিল সমাধি;
পথের ঘূর্ণি থেকে পাওয়া স্বপ্নগুলো
আমাকে কেবলই শোনায় স্রোতের গান;
এইসব স্বপ্নসূত্র জানতে জীবনের দামে
আমি কিনে নিয়েছি এক খোয়াবনামা;
খেয়াঘাটে অবসর পেলে একদিন
জেনে নেবো এইসব স্বপ্নের মানে।

সঞ্চিতা দাশের দুটো কবিতাঃ

১.

ফিরে এসো রবীন্দ্রনাথ

প্রস্থ উঠন জুড়ে শুধু কপট নির্মাণ
আত্মঘাতী বাতাসের বৃত্তবিলাপ
ধাক্কা খেল ভুল পাঠক্রমের
এই সংযোজন!
এই তো যোগ্য প্রহর
ফিরে এসো আত্মীয় মন,
দৃশ্যদূষণ অন্ধকারে নিয়ে এসো
শুভেচ্ছার একফালি চাঁদ;
অনভ্যস্ত মহড়ায় বেজে উঠুক
বিষন্ন পৃথিবীর পরাভূত সঙ্গীত!

২.

ঋদ্ধ করো

যদি চাও নিবিড় করে বাঁচা, শুদ্ধ পরিত্রাণ;
আরও কাছে এসো...
চুপচাপ দাও সেই অনিবার্য আগুন !
ঘরোয়া দুঃখগুলি পড়ে থাক পাশে
প্রেমের পরশে উথলে ওঠা নদীজল তুমি নাও-
বুকের কপাট খুলে মাঝরাতে বাঁধভাঙ্গা ঢেউ!
অন্ধকার ভেদ করে ছুটে যাক সহস্র বাণ
বাতাসে উবে যাক অভিমানী মেঘ।
উৎসমুখ থেকে আনো স্মৃতিগন্ধ , অশেষ গহন;
আমি স্নান করে ঋদ্ধ হই।

গোশালায়

সন্তোষ সিংহ

আমি তোমার কথা আর কাউকে কোনোদিন বলতে যাব না
তোমার কথা বলতে গেলে দিনগুলোর মেরুদণ্ড
ভেঙে টুকরো টুকরো রাত হয়ে যাচ্ছে
কবিতাগুলো ধূসর বাদামি পাতায় শব্দ ছড়াতে ছড়াতে
শ্মশানের আগুন হয়ে যাচ্ছে
তোমার কথা বলতে গেলেই প্লাবনগুলো মরুভূমি
গিলতে গিলতে মৃতদেশ প্রসব করছে
দাঁড়াবার জায়গাগুলো বেকার ছেলেমেয়েদের
চোখের জল মেখে ক্রমশ অতল হাহাকার হয়ে
বুকের বামপাশে দলা পাকাচ্ছে
ইস্তেহারগুলো অপেক্ষা করতে করতে প্রতিশ্রুতির
দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে মহাকালের ডালে ঝুলে পড়ছে

তোমার কথা আর কাউকে কোনোদিন বলতে যাব না
বলতে গেলে লোকে বিশাল বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ির
ভেতরে টাকার পাহাড় দেখায়
দেখায় কীভাবে নিহিত পাতাল ছায়ায় পরকীয়া
গগনচুম্বী হয়ে বিস্ফোরক হতে থাকে
তোমার কথা বলতে গেলেই দুর্নীতির আকাশে
নরশকুনের দল কীভাবে বৃত্তাকারে উড়তে উড়তে
চোখের তারায় রক্তনদী এঁকে ফেলে
তোমার কথা আর কোনোদিন কাউকে বলতে যাব না
বরং তোমার নাম চিরহরিৎ হৃদয়পত্র থেকে
চিরতরে মুছে ফেলতে আবার আর একবার
জন্ম নেব এই গোশালায়

অমোঘ

নন্দিতা সেন বন্দোপাধ্যায়

পিতৃতর্পণের পর,
পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া
স্নেহঋণ স্বীকার করি

একেক সময় অমোঘ হয়ে ওঠে
তাদের আশীর্বাদের ফুল

খড়ের ওপর কোমল মাটির প্রলেপে
ধীরে ধীরে যে প্রতিমার
সৌন্দর্যের স্ফুরণ ঘটে,
দৃষ্টি দানের পর,
তাঁর চোখের প্রদীপ্ত আলোই
সেই অমোঘ সত্য ঘোষণা করে।

হাবিবুর রহমানের দুটি কবিতা

১.
আমাদের নিজস্ব পৃথিবী

কোথা থেকে উড়ে এসে একটি মেঘ
ঢেকে দেয় আমাদের আলোকিত মুখ
আলোর রেণু সাঁতার কাটে অন্ধকার গুহার ভেতর
আমাদের নিজস্ব পৃথিবী
সঙ্কীর্ণ গলিপথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে,
মাথার উপর বসে থাকে বাজপাখি
আমাদের ছাদে বসা কাক
পুচ্ছ লাগিয়ে ময়ূর সাজে

২.
নগ্নতা

আমাদের দর্শন বিপদগামী
রোদের ভেতর জলের ভেতর
অন্ধকারের ভেতর নগ্ন হই।

কাব্যাঞ্জলি

পার্থ সারথি চক্রবর্তী

১.

কাটাকুটি করে পুরো খাতাটাই শেষ হয়ে গেল
ক্যালকুলাসের চ্যাপ্টার নাড়াচাড়া করে চলছি দিনের পর দিন।
ইন্টিগ্রাল মেথড তো কবে ভুলে গেছি,
শুধুই ডিফারেন্সিয়েশন করে যাচ্ছি দিনের পর দিন।
শুধু কি আমি !
আমি, তুমি, আমরা, তোমরা সবাই দিনের পর দিন।

২.

আপেল পড়ার পর্যবেক্ষণ থেকে অভিকর্ষ বুঝেছিলেন নিউটন।
কিন্তু ভালোবাসা খসে পড়া দেখেন নি,
বিশ্বাসের পতনকে বিশ্লেষণ করেন নি;
তাই আজও এদের পড়তে দেখি কোনো সূত্র ছাড়াই,
কারণে, অকারণে বা ভুল কারণে,
যদিও মাটি অবধি পৌঁছয় না কখনোই।

৩.

জীবনের প্রতিটি পদে যেন মেকানিক্স।
দম দেওয়া ঘড়ির মতো ছুটে চলেছে জীবন, যাপন!
মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে মুখ ক'রে তাকিয়ে থাকে!
পিথাগোরাসের সূত্র মেনে শরীরকে ভাসাই অতল গহ্বরে।
সূত্র দিয়ে তারপরও জীবনকে বাঁধা যাচ্ছে না, সবসময়, নিরলস।

জন্মান্তর

উৎপলেন্দু পাল

হয়তো আমার একটা গাছ জন্ম ছিল
হয়তো বা একটা ক্ষুদ্র পাখি জন্মও
কিন্তু মানুষ জন্ম ছিলো না কোনোদিন,

গাছ, পাখি, মানুষের সম্পর্ক বুঝি না-
শুধুই বারংবার দেহান্তর জন্মান্তর,

এ জন্মও ঠিক যেন মানুষ জন্ম নয়
স্বর্গ আর নরকের মাঝে দোদুল্যমান
এক অসহায় দ্বিপদ পশু জন্ম মাত্র।

কাঁচঘর

সারাবেলা কাঁচের ঘরে বসে বসে দেখি
শৈশবের কাঁচপোকা ধরার দিনগুলো

এখন ঢিল ছোঁড়ার অভ্যেস ছেড়ে দিয়েছি
তবুও হৃদয়ের গভীরে কাঁচ ভাঙার শব্দ

ঘরের ভেতর প্রতি মুহূর্তে ঋতু বদলায়
ঝড় আসে বাজ পড়ে ঝনঝন শিলাপাত

তবুও আঁকড়ে বসে থাকি ভঙ্গুর কাঁচঘর
অনাগত মধুমাসের আকুল প্রতীক্ষায়।

সুখের অসুখ

কঙ্কন গঙ্গোপাধ্যায়

নদীর বিস্তার ছুঁয়ে থেমে গেছে মুখপোড়া ঘুড়ি
অবশিষ্ট রয়ে গেছে শুধু তার হাড়ের কাঠামো
বেবাক আকাশ জুড়ে অবিরাম যত জারিজুরি
বলেছি হাজার বার দম নাও, কিঞ্চিৎ থামো।

মানেনি সে কোনও মানা মিশে গেছে আসমানি নীলে
এখনও বসন্ত আসে শহরের ভিখারি পাড়ায়
আবছায়া উঁকি দিয়ে ডুবে যায় জলের নিতলে
মৃত তিতিরের শব দুলে দুলে ভেসে চলে যায়।

রঙের বাহার ছিল শরীরের অলিগলি জুড়ে
শত্রুর ছল ছিল অনুপাতে আরও কিছু বেশি
কিছুই বোঝনি তুমি! নিয়তি দাঁড়িয়েছিল দূরে
অচেনা করুণ সুরে বেজেছিল অভিমানী বাঁশি।

চক্রব্যূহে অভিমন্যু অতীতে মরেছে বারবার
স্বজনের ষড়যন্ত্রে নির্মিত হয়েছে মৃত্যুমুখ
বিশ্বাসের বিনিময়ে বিশ্বাস হয়েছে ছারখার
অকালে হারাতে চাওয়া এও এক সুখের অসুখ।

কীর্তন

বন্দিশ ঘোষ

একক স্তবগানে মাঝে মাঝে কান পাতি
স্পষ্ট অস্পষ্ট নানান ছবি ভেসে বেড়ায়
কখনো মুগ্ধতার জলতলে মাথা পৌঁছোয় না
আবার কখনো জেগে থাকি ছাইয়ের ওপর
ক্ষয়ে যাই, লুটোপুটি খাই
ধুলোয়, মহাশূন্যে...
চারিদিকে সরবরাহের সুর, ভাষা ভাঙাগড়া
প্রেম, হিংসা, বিস্ময়, অমাবস্যা -
মিলিয়ে যায় এক এক যুগের অকুল প্রয়াস,
কত শত আশার আবেশে
ঢলে পড়ে চন্দনের শাখা
নিখিল ভুবন আকাশ ব্রহ্মময়...

টান

নীলাদ্রি দেব

এসব আলো অন্ধকারের বাইরে
ধূসর কোনও এক পাল্লা রাস্তা
বাঁক ঠিক কাকে বলে
ছায়াআফিম ঘিরে রেখেছে
আদি জন্মের সুতোয়
তীব্র টান পাই
নড়ে ওঠে মাঠের সবুজ

শিবির

নীলাদ্রি দেব

কিন্তু এবার চুপ
ফার্ন পাতা কতটা নিচু করছে মাথা
বায়বীয় মূলে না-বলা কথা জমে আছে
দৃষ্টিভ্রম থেকে দূরে সামান্য শিবির

জীবকথা

দেবাশিস সরখেল

এই দেশে
এই কৃষ্টি
এইখানে বগলার জীব
লালজবা
পাঠা ছাগলের নিশ্চিন্তে চিবোনো বেলপাতা।

দন্ডী দিতে দিতে এগিয়ে যায় একশো সাতান্ন অনুচর
আকন ধুতুরার ঝাড়
বিশ্বাস প্রত্যাশার রথচক্র মন্দির চত্বরে স্থানুবৎ।

এখানে ঈশ্বর কণার গল্প বলতে গিয়ে
সেই দেশের কথা
সেই সৃষ্টির কথা আসে
ধান ভানতে গিয়ে
এইখানে যেই গান গাও
তাইতো হয়ে যায় শিবকথা
জীবকথা।

আধাছেঁড়া খাতায় বোমার শব্দ

শ্যামলেন্দ্র চক্রবর্তী

নভোচারী নল রেখে ওরা এল
পৃষ্ঠপোষকতায় ইনসাস
সবে ভোরের সূর্য লাল হয়ে উঠছে তখন
সবুজের আড়াল থেকে
তিনখানি এসইউভি,
জনাকীর্ণ জঙ্গলী পোশাকের টেমপার্ড কোতোয়াল
আরও কয়েকজন বুকচওড়া অফিসার
সাদা পোশাকে
তারা ঘুম থেকে তুলে তোষকের তলা দেখলো
খাটের তলা, আলমারি
স্নানঘর, জুতোর বাক্স থেকে আমাদের রেক্টাম
বাদ রাখেনি কিস্যু কোনো মহল;
বললাম, কী খুঁজছেন? সোজা জিজ্ঞাসা,
রাজনীতির লোক নই, ছবিও আঁকতে পারি না
পারি না ছলাকলাও।

ওদের থেকে এক হাট্টাকাট্টা বলল,
এ ঘরে অনেক বোমা ঘুমিয়ে গোপন খবর,

পুরোনো তাকের উপর চোখ খেলিয়ে বললাম,
খুঁজে দেখুন ভালো মতন
আধাছেঁড়া খাতায় বোমার শব্দ পেলেও পেতে পারেন।

অধ্যাত্ম

অনিরুদ্ধ সুব্রত

শব্দের অধরে পড়ে আছি সারারাত
ভাবের ওষ্ঠে গেয়েছি কোন শাক্ত গান
কবিতার মন্দিরে সে যে কী মৃদঙ্গ ধ্বনি
ইহ বর্ণমালার, আহা প্লাবিত ভক্তিবাদ

পোকার জীবন থেকে গুপ্ত পূর্ণিমাতে
ও ! সমৃদ্ধ, অকাল ছুঁয়েছে অনন্ত ঢেউ
থেমে থেমে ঘ্যানঘেনে নষ্ট জৈবের ঘর্ঘর
নেমেছে অরূপ, মানুষ ও কবিতার ঈশ্বর

ঝাঁক ঝাঁক উড়ন্ত পঙতি, বাকমুখর
শরীরের জল ছুঁই ছুঁই চারণভূমি জুড়ে
লিখেছি, খুঁটে খুঁটে, প্রত্ন মাছের সন্ধান
সৃজন অনুসঙ্গে কবি ও কবিতার সঙ্গম।

নৈঃশব্দ্যসাধনা

ঊর্মিলা চক্রবর্তী

মৌনতার কাছে হাঁটুমুড়ে নৈঃশব্দ্যসাধনা।
কুয়াশাসন্ধ্যার ক্লান্তি বোধের আকাশ ঢেকে
ফোঁটা জল টুপটাপ পাতায় পল্লবে।

অস্ফুট কাকলি আবছা আলো ভেঙে।
নতুন শব্দেরা চোখ মেলে, চোখ বোজে।
কিছু ওরা এনেছিল, বেজেছিল প্রাণে
আভাসের মতো।

প্রত্যয়ের স্থিরতা কখনও সহজিয়া ছাঁদে
বয়েছিল ভাবনার ঋজু স্রোতে খর বৈঠা বেয়ে
প্রখর আলোয়।

সন্ত্রস্ত পাখির মতো শব্দেরা ধোঁয়াশা কেটে
আলোয় ফিরবে বলে নিষ্ফল প্রহর গোনে।

আলোর দুচোখে ছানি, আজ শুধু নৈঃশব্দ্যসাধনা।

শিউলি একটা প্রতিষ্ঠান

সঞ্জয় সোম

আমরা তো শুনিনি শিউলির কোনও প্রতিপক্ষ আছে
কারও সাথে আড়ি দিয়ে শিউলি সরিয়ে রেখেছে নিজেকে

সুতনুকার কথা আমরা বিশ্বাস করি না।
যেমন বিশ্বাস করি না আমাদের মানসীর কথা।
আমাদের শিউলি নিজেই এক মহৎ প্রতিষ্ঠান
মন্দির মসজিদ গির্জায় ওর যাওয়ার কোনও দরকার পড়ে না।

যে দিন শিউলি আমাদের থেকে ওর মুখ ফিরিয়ে নেবে
শুকিয়ে যাবে ওর শেকড়
আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সে দিনটা হবে
রাতের থেকেও ভয়ঙ্কর

আমি শিউলির কাছে চেয়েছি ওর সমগ্র শুভেচ্ছা।
চেয়েছি নতুন সূর্যোদয়-কথা।

সমস্ত রাস্তা এগিয়ে যায়

উদয়ন চক্রবর্তী

এক ঝাঁক পাখি অচেনা অজানা
তবুও কেমন যেন মনে হয় চিনি
দেখেছি কখনও কোথাও
উড়ে যাচ্ছে ছবি আঁকতে আঁকতে
নিজস্ব কোলাহলে হৃৎপিণ্ডে সুখের বাতাস ভরে
আমাকে দুয়ো দিতে দিতে

তখন শহরের শরীর জুড়ে জ্বর বিষাদ
কপালে হাওয়া করে চলে যাচ্ছে ওরা
শূন্যতায় সমস্ত হাহুতাশ ফেলে রেখে

আমরা অঙ্ক কষে কষে
ফুলকে পাথর বানাই পাথরকে ফুল
গান লিখি 'ভুল সবই ভুল এই জীবনের'
সময় উল্টে দেয় পাতা সময় মতো

পাহাড়ের উদাস নিস্তব্ধতা একটা ব্যর্থতা না যেন
ও হেসে কথা বলতে চায়
কিন্তু ঝর্না নামি অনামি ফুল ওর শরীর জুড়ে
ওকে থামিয়ে কথা বলতে থাকে
আর শহরের বুকের ওপর দাপিয়ে হেঁটে
বেড়ায় মানুষ নামের সরীসৃপ শ্বাপদ

এরপর সমস্ত রাস্তা এগিয়ে যায়
কবরস্থান আর শ্মশানের ঠিকানায়।

এইতো আমার বাংলাদেশ

সেবু মোস্তাফিজ

রাম রহিমে দোস্তি বেজাই
কুস্তি করো ঠাকুর হুজুর
এক গায়েতে দুজনার বাস
কণ্ঠে তাদের মিলনের সুর।

তোমরা করো দাঙ্গা ফ্যাসাদ
ধর্মের দোহাই গেলো ধর্ম
স্রষ্টার নামে ফসল ফলাই
রাম রহিমের এটাই কর্ম।

রামের কাঁধে রহিমের বোঝ
রহিম খোঁজে রামের ছেলে
মিলে মিশে দুই পরিবার
বিভেদ তোমরা কোথায় পেলে।

রামের গিন্নি রহিমের বউ
হলুদ নুনের লেনাদেনা
এক হাটেতে দুইজন চলে
রহিম মিটায় রামের দেনা।

রামের ছেলে শয্যাশায়ী
সবার আগে রহিম ছোটে
দুহাত তুলে খোদার কাছে
রোগ মুক্তি চাই দোয়া ঠোঁটে।

মেয়ের বাড়ি সাধের দিনে
রহিম যাবে মেয়ের বাড়ি
রামের গিন্নির বেশ ব্যস্ততা
তৈয়ার তখন রামের গাড়ী।

রাম রহিমের এইতো বেশ
এইতো আমার বাংলাদেশ।

তারপর

প্রতীক মিত্র

তারপর আরো নিশ্চয়ই কিছু থেকে যায়।
ক্ষীণ অনুষঙ্গই সব কিছু নয়।
নিঝুম অরণ্য মনে রাখে
সেই সমস্ত নিঃশ্বাস
সাপের খোলসের মতন ফেলে আসা বিশ্বাস।
ফাঁকা বইয়ের তাকে
জমে থাকা ধুলো
চৌকাঠ পেরোনো চালচুলো
বোজা চোখে বিস্ময়
ঘষা আয়নায় নিজের পরিচয়।
নিঝুম অরণ্য নিশ্চিত কিছু কিছু মনে রাখে
সেই সমস্ত নিঃশ্বাস
সাপের খোলসের মতন ফেলে আসা বিশ্বাস।

ঋতু দেখা রোজনামচা

ঋভু চট্টোপাধ্যায়

এখন অভ্যাসের মঞ্চে দিব্যি গাঁথা থাকছে
মৃত হয়ে বেঁচে থাকবার রোজনামচা,
ঋতু দেখে আর কাজ নেই, বারোটা মাস
ঘামাচি আর উন্মাদের সাথে ঘর করবার
কোন আক্ষরিক শিলালিপি না থাকলেও
ঘরের ভেতরে উদ্ধার হওয়া স্রোতেও
সেই ঘামাচি গন্ধ। তুমি ভাই, চোখ খুলে রেখো।
আমার মাঠময় দেবদারুর হাত,
ফাঁকি দিয়ে যে রাস্তায় কঙ্কাল শুয়ে থাকে
তার বুকে আমার রবারের চাকা।
রোজ তো সেই সোজা আর আধবোঝা
গলির কথোপকথন। ভালো হবার কোন
বিশেষ সমাস না শিখলেও বুঝতে পারলাম
নুন না গণিতের পটি ভাগ করেই বান্ধবী

ইতিহাসের অক্ষর হয়ে যায়।

আঁচল

সুব্রত দেবনাথ

একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমার বৃত্ত
তার ব্যাসার্ধের মধ্যে দোলনচলন
অক্সিজেন টানি কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ি বিজ্ঞান তাই বলে
প্রতি লিটার জল কুড়ি টাকা দরে কিনি
এখন আঁচল কেটে ব্লাউজ বানাতে হয় এটাই নিয়ম

এক সময় ছেঁড়া শাড়ি সেলাই করে পড়তে দেখেছি মাকে
তখন মার কাছে আমি আবদার করতাম, আর
মা তাঁর আঁচলের গাঁট খুলে সেই আবদার মেটাত।

সুস্মিতা তোমায়

তপন মাইতি

শৈশবের দিনগুলো কীভাবে কেটেছে বলতে পারব না।
যেভাবে একশো বছর অন্তর পৃথিবীর বুকে জটিল ব্যাধি হয়।
তবুও তাকে নিঙড়ে আনি মাতৃভাষা, বিপ্লবী জিহাদ।
এখনও আমরা কাঁটাতার ডিঙোতে পারিনি।
সোনালী রোদ কিন্তু ওসব মানে না, জেনেছি বারো বছর পর।
একটি খেসারি ফুলের মুখ, আকাশ থেকে এক ফোঁটা নীল
নিয়ে তোমার হাতে দিয়ে গেল।
এরচেয়ে ঢের বেশি দিতে পারে অনেকেই...
হয়তো ভাবতে পারো ‘এইটুকু নীল দিয়ে কী বলতে পারে ও’
আমি আলপথ ধরে হাসতে হাসতে চলে গেলাম সুস্মিতা
বলে গেছি পৃথিবী ভালো থেকো, এক বুক ভালোবাসা নিয়ে।

সেই মুখ

মানস মজুমদার

তোমার মুখে দেখতে পাই
ধ্রুপদী সঙ্গীতের মতো শান্ত অনুভূতি
অপূর্ব সুরের মায়াজালের বিস্তার
মনে এঁকে চলে নিসর্গের জলছবি
বাতাস অথবা সুন্দর কবিতা
যা অনুচ্চারিত তবুও আমি শুনতে পাই
সুরের মোহজালের বিস্তার থেকে ঝালা
মুখের রেখাগুলো সব সুরের রেখা থেকে
প্রকৃতির বিমূর্ত ছবি হয়ে যায়
বিমূর্ত ছবির মধ্যে দেখি সেই মুখ
অনুসরণ করি হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে
পণ্ডিত চৌরাসিয়ার পাহাড়ি ধুন শুনতে শুনতে
অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে
সেই মুখ খুঁজে চলি-
কখনও কখনও ভেসে ওঠে সেই মুখ
নক্ষত্রের মাঝে চাঁদের কিরণচ্ছটার ভিতরে
যে মুখ আমি হেমেন মজুমদারের আঁকা ছবিতে দেখেছি।

কবির সম্বল

হরিদাস পাল

কবি তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইটি বুকে আঁকড়ে ধরে
চুপচাপ বসে আছেন আবছা আলোয়।
সমস্ত আলো যেন উপচে পড়ছে চোখ দুটোতে।
এই তাঁর সারা জীবনের শেষ সঞ্চয়, শেষ সম্বল।
একটা পাখি উঁকি দিয়েই চলে গেল, হয়তো
ভাবল অন্য জগতে, বিব্রত না করাই ভাল।

বাড়ি ফেরার পথে দেখি এক ইঞ্চি মাটির ঝামেলা।
খানিক বাদেই রক্তপাত। আমি ভাষাহীন!
কবিতার খাতা খসে পড়ে হাত থেকে

বাধিত পরিণাম

শ্রীমন্ত সেন

আমায় যখন একলা আমি পাই,
তখন শুধু চুপটি করে থাকি,
হু-হু করে দ্বীপান্তরের আলো
বুকে এসে করে মাখামাখি।

জানি না এ কেমনতর দেখা,
কেমনতর দোলাচলে ভাসা,
রাতপেরনো গন্ধে মাতামাতি—
মুঠি খুলে গড়ায় ভালবাসা।

এতই যদি নিজের পরে টান,
নিজের থেকে কেন দূরে থাকা,
আমিও জানি কাটাকুটি খেলা—
কী গান ধরেন হঠাৎ আল্লারাখা।

হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যাওয়া—
নিমেষ কি আর যুগের সমান হয়?
নিজের সঙ্গে নিজের দেখাটুকু
কখন আনে একান্ত সংশয়!

ইচ্ছেসুখের অবাক পরিহাস
দিনরাত্রির ঝরায় শুধু ঘাম—
আজকে যেটা মনখারাপির ধাঁধা,
কালকে সেটা বাধ্য পরিণাম।

মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে

প্রনতি তালুকদার

মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে! সবখানে বিষণ্ণ আলোয় ভয়ে শিউরে উঠছে। চেতনার নির্বোধ ছায়া কখন নিভে যায় কেউ টের পায় না। অন্ধকারে কারা যেন নিজেকে ঠুকে ঠুকে আগুন ধরিয়েছে। চুপিচুপি রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। কেন ওরাও হারিয়ে যায়!

মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে! মানুষের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছেটা ভাসিয়ে চলে যাওয়ার পথে আমার জরাজীর্ণ দেহকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। করুণ সুরে কাঁদছে আর বলছে জ্যোৎস্না দিয়ে ঢেকে গেছে তোমার রুগ্ন দেহটা।

মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে! ভোরের হাওয়ায় শরীর কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। আজ ভীষণ নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে। সারা ঘরে দেয়ালে ঝুলছে মন খারাপের করুণ কাহিনি। হঠাৎ চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে! ডাক্তার হাত নামিয়ে নিয়েছেন। ভোর হলে খুব ভালো লাগে আবার বাঁচতে ইচ্ছে করে। রাত্রের কালো যেন মায়ামন্ত্রে ঘরের ভিতর আঁকড়ে ওঠে। আবার ভোরে সব শান্তি, যেন কিছুই হয়নি।

বর্ণজিৎ বর্মনের দুটি কবিতাঃ

বিল

সংসারে ঝগড়া থেকে পুরোনো
কাঠের বাক্স উঠে আসে

শরীর ভেঙে গেলে
পুরনো বিলের কাগজগুলো
অনাথের মত পড়ে থাকে
ড্রেনের ধারে-

অবহেলার ইতিহাস
এইভাবে প্রকাশ্যে আসে

অস্ত্র

সচল প্রতিবাদ জানেনা বোবা।

শানবাঁধা মহানন্দার ঘাটে বসে দিন কাটে
সকালের মেঘ উড়ে
বিকেলের মেঘ আসে মাথার উপরে
তবু সে ভেবে ভেবে যায়-

কিভাবে প্রতিবাদ হবে-
অস্ত্র কোথায়?

আগুনের গল্প

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

আগুনের চারপাশের গল্পগুলো
উষ্ণতায় উজ্জীবিত করতে পারে আমাদের।
পুরোনো জীবনযাত্রার বেশ কিছু অংশ
শক্ত প্রতিরোধের বিরুদ্ধে পুনরুদ্ধার।
কিছু আবার তরঙ্গের বিপরীতে
সাঁতার কাটার আখ্যান - ভারি রোমাঞ্চকর।
কিছু শব্দের প্রতিধ্বনি এখনও শুনি
সময়ের ক্ষত চিহ্ন সারানোর সুরেলা সিম্ফনি।
চোখ বন্ধ করে সবকিছু থেকে মুখ
লুকিয়ে থাকাটা কি থাকা !
যদিও শীতার্ত আমরা আর ভীষণ একা।
এই আগুনের গল্পগুলো থেকেই আমাদের
নির্বাসন থেকে স্বমহিমায় ফিরে আসা।

শেষ সত্য

রহিত ঘোষাল

অন্তরীক্ষকে শ্বাসরোধ করে
হত্যা করা হয়েছে
প্রনব বায়ুর আশ্রয়
পৃথিবীর সব দিকসমূহ
মহাজীবন গেছে মানভূম
আজ পথে পথে
রক্তের উৎসব
জরায়ুতে তীর্থস্থান

সন্ধান

অজিত কুমার জানা

বহুদূর চলে গেছে পথ,
পদচিহ্ন যানে চড়ে।
এখনও সেতারে কাঁপছে গলা,
মাটি ফুঁড়ে শিকড় চলেছে,
পিপাসার জলের সন্ধানে।

পলক জানে না, তার তীক্ষ্ণতা,
পিঁপড়ের একটুখানি কামড়,
মুহূর্তেই ঢোকে দরজা খুলে।
নীরবে কুরে খায় সব,
কেউ দ্যাখেনি ভিতরে।

অনাবাদি মন রোদপিঠে ঝুলে,
বোনে অনবনত আশার বীজ।
কাঠিতে কাঠিতে ঠোকাঠুকি লাগে,
বহুদূর চলে গেছে পথ,
অদৃশ্য যাত্রা বিন্দু কাঁদে।

রুগ্ন পীড়িত সংখ্যা অসহায়,
কথা নেই মুখে।
গভীরে রুদ্ধশ্বাস একা,
হাতড়ে বেড়ায় আপন ঠিকানা,
আকাশের নীল শুধু ডাকে।

নির্ঘুম অভিমান

নরেশ মল্লিক

মেঘবালিকা,
আমি যতবার তোমাকে উত্তর দিতে বসি
মেঘেরা কেমন ছেয়ে ফেলে নীল আকাশ,
গাছেদের মুখে ফুটে ওঠে ম্লান হাসি
অকারণে থমকে দাঁড়ায় বাতাস।

আমার কথাগুলো তাই খাতা বন্দী হয়
এলোমেলো ঝাপসা শব্দ আজ নির্বাক,
রাত জাগা পাখিটা দেখো নির্ঘুম রয়
তোমার কথা না হয় কবিতায় থাক।

রাত্রি যখন হয় না আর ভোর...
পাহারা দেয় অন্ধকারের পাখি,
অস্পষ্ট নক্ষত্রগুলোর কাটে না ঘোর
ক্যানভাসে মেঘবালিকা তোমার ছবি আঁকি।

শুকতারা আকাশে আবছা হয়ে জ্বলে
চাঁদটাও যেন ক্রমশ অদৃশ্য হতে চায়,
পুরোনো লেখাগুলো ইতিউতি কথা বলে
ইতিহাস কঙ্কাল হয়ে ধরা দেয়।

তুমি যতই করো আঘাত উল্কাপাতের মতো
রাতের শিশির ঝরে পড়ুক নির্বাসিত দহনে,
বুকের মাঝে জমিয়ে হাজার ব্যাথার ক্ষত
মেঘবালিকা, তুমি আমার নির্ঘুম অভিমানে।

রূপের সূক্ষ্মতা

আশিকা মোল্লা

রেশমী ঝালরের মতো একরাশ কেশরাশি-
তার স্নিগ্ধ ঘ্রাণে ,হৃদকোষ
শতদলের মতো উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।
অবিচল দুরন্ত দুটি কনীনিকা
যেন নিদারুণ অভিমানে জ্বলজ্বল করছে।
নীলাভ ধমনীগুলো যেন ক্রমশ
সচ্ছতার বশে আরো পীতাভ হয়ে উঠেছে।
তৈলাক্ত ত্বকে ঘর্মবিন্দুগুলো,
রত্নমালার মতো ঝলমল করতে থাকে।
ঢুলু ঢুলু চক্ষুর সুসূক্ষ্ম কৈশিক
জালবিন্যাস যেন মায়াবী রহস্যে ভরপুর।
রূপের তিমিরদৃষ্টি ঘুচিয়ে
এই সৌন্দর্যের স্তবক ফিকে হবে একদিন।

জীবনচক্র

সুদীপ্ত বিশ্বাস

রাশি রাশি হাসি ঝরনার জলে ঝংকার তুলে যায়
আমার তোমার সবটা ছাপিয়ে আকাশের আঙিনায়।
তাই বুঝি আজ বাঁধন ভেঙেছে, আকাশ নেমেছে কাছে
আকাশের দিকে চাইলেই দেখি, সব আছে, সব আছে!

মৃত্যুও দেখ মাঝেমাঝে এসে জীবনের গান গায়!
জীবনপারের সীমানা ছাড়িয়ে ওই দূর নীলিমায়।
আয়নাতে দেখি অবয়বহীন মৃত্যু ঘুমিয়ে আছে
ভেবেছি যাব না, তবুও কেন যে ফিরে যাই তার কাছে!

আবাহন

সুশান্ত সেন

আবাহন করে নিয়ে আসি পরাধীনতা
তার কাছে সমর্পণ করি নিজেকে-
ভুলে যাই অনন্ত বিশ্ব অপেক্ষায়-
উন্নত মানুষের অপেক্ষায় ,
কখন মানুষের মাঝে মানুষের উদয় হবে?
আকাশে রামধনু ওঠে , মিলিয়েও যায়
আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে
সময় কাটাই আমরা
এদিকে বন্য ক্রূরতা ছলে বলে কৌশলে
সাপিনীর বিযাক্ত শ্বাস ফেলতে থাকে
মদমত্ত ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা কুক্ষিগত করে
আবাহন করে নিয়ে আসে পরাধীনতা।

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের দুটি কবিতাঃ

১.

পরমার্থ

নির্জনতা ডুবিয়ে দেয়
ভাবনার পাতালে-
নিস্তব্ধতা কথা বলে

পাতালের এক আঁজলা
জল নিয়ে লিখে ফেলি
বৃষ্টির ভাষা

বৃষ্টি শেষে যে রংধনু
তাইই উসখুস- আনন্দ।

২.

আশ্রয়

প্রতারক ছায়ার আশ্রয়ে
পাশার কোটে ঢুকে যাচ্ছি

টুপির খেলা দেখাতে দেখাতেই
ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ কেউ কেউ

প্রতি দানে ভূতের বাচ্চা
আনন্দে নেচে উঠছে

চর্যাগীতি
শৈলেন দাস

ভাজা মাছটি খেতে মজা ভাজলে মাছের তেলে
লুকিয়ে খেল মুরগি শেয়াল পাখনা গেল ফেলে
দেয়াল জানে ঘরের মালিক কোন ছিলিমে তামাক খায়
বে-পাড়ার এক ভ্যাবলি মেয়ে ঘুম কেড়ে নেয় এ পাড়ায়!

ভালোবাসার সুতোর বাঁধন গিট্টি বিনা অটুট হায়
শাড়ির ভাঁজের প্রজাপতি একটুখানি উড়তে যায়
সুতো কেটেও ছিন্ন ঘুড়ি লাটাইর কাছে ফিরতে চায়
ও পাড়ার এক ভ্যাবলি মেয়ে ঘুম কেড়ে নেয় এ পাড়ায় !

কানার কাছে রঙের সুনাম দেখতে পেলে ঢাকনা দি
গরু মেরে জুতো দানের মন-খুশিতে আহ্লাদী
চামড়া ছুলে লবন মাখে খগেন তবু টপ্পা গায়
বে-পাড়ার এক ভ্যাবলি মেয়ে ঘুম কেড়ে নেয় এ পাড়ায় !

চোখ খুলে মাছ ঘুমায় বলে শালুক ফোটে সব ডোবায়
ছুটে চলে তারই পিছে ডাকতেছে যে 'আয় রে আয়'
গাইছে পাখি 'গাব খাব না' কষ্ট শেষে আবার খায়
বে-পাড়ার এক ভ্যাবলি মেয়ে ঘুম কেড়ে নেয় এ পাড়ায়!
বে-পাড়ার এক ভ্যাবলি মেয়ে ঘুম কেড়ে নেয় সব পাড়ায় !

নন্দনাথের আশা

চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

তপ্ত রোদে গঞ্জ ঘুরে ব্যবসা করে নন্দ
ক্লান্তদেহে কষ্ট ক্লেশে পেটের দায়ের ছন্দ।
একবার তার কান্ড দেখে চক্ষু ছানাবড়া
দশ গন্ডা কলা খেয়ে হাটের মধ্যে সেরা
নন্দনাথের বয়স এখন বছর চোদ্দ হবে
বইপত্তর লাটে উঠলো বাপ মরলো যবে
অঙ্কটাতে ভালোই মাথা বাস্তবটাই গল্প
বঙ্গভাষার ছেলে বেচারা জানে অল্পসল্প
নন্দ তুমি স্কুলে যাবে দিদিমণির হুকুম
নিচুস্বরে নন্দ বলে আমি কথা রাখুম
নন্দ জানে সাচ্চা কথা মাষ্টারমশায়ও কন
হকারিতে নাই শান্তি পড়ায় দিমু মন।

এক রত্তি

মৃন্ময় ভৌমিক

ছোট্ট একরত্তি, এক ছেলে
ডানপিটে তার ধরণ,
আহামরি দেখতে নয় মোটে
মিষ্টি হাসি সারাক্ষণ।

নৌকা চালায়, গাছে চড়ে
লম্বা কোঁকড়া চুল,
মা,মাসিরা ভুরু কোঁচকায়
পাড়ার চক্ষু শূল।

সেই ছেলেটাই মাকে গড়ে
পূজো নিয়ে ব্যস্ত,
আঁধার ঘরে মা আছে তার
দীর্ঘদিন পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

একটি অসমিয়া কবিতা

উপেক্ষিতা

নবযানী বৰুৱা শইকীয়া

তোমাৰ এটি মালিতাই মোৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰিবলৈ যথেষ্ঠ।
এটি মাথোঁ গানে হৃদয়ত খলকনি তুলিবলৈ যথেষ্ঠ।।
এষাৰ মৌ মিঠা মাতত, জীৱনৰ জয় গান গাবলৈ
এটি মিঠা হাঁহিত, সকলো দুখ পাহৰি যাবলৈ
মই যে সদায় প্ৰস্তুত।।

শেৱালি ফুলক বা নুফুলক , মই ৰৈ থাকো শৰৎ অহালৈ।
দেৱী আহক বা নাহক , মই অপেক্ষা কৰো মাদল বজালৈ
বাস্তৱ হওঁক বা নহওঁক , সকলো সপোন মোৰ
দেখা হওঁক বা নহওঁক , দিঠকৰ স'তে মোৰ
সন্মুখীন হ'বলৈ মই সদায় যে প্ৰস্তুত।।

উপেক্ষিতা মই আজিও তোমাৰ হৃদয়ৰ পদূলিত।
অৱহেলিতা মই আজিও তোমাৰ মন ফুলনিত।।
জাগক বা নাজাগক প্ৰেম , হিয়াৰ দাপোনত
সাজক বা নাসাজক ঘৰ , ভালপোৱাৰ বাকৰিত
আত্মজাহ দিবলৈ মই যে সদায় প্ৰস্তুত।।

গদ্য সংখ্যা

‘শাদ্বল’ সাহিত্য ই-পত্রিকা

পঞ্চম সংখ্যাঃ শ্রাবণ/ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ; অগাষ্ট/২০২৩ ইং

www.facebook.com/ShadwalMagazine

সম্পাদকঃ

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদঃ

শামসুল হক আজাদ

টাইপ সেটিং ও মূদ্রণঃ

সম্পাদক/ শাদ্বল

ঠিকানাঃ

খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার সদর

জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭

শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

হাই টেক সিটির শিল্প গ্রাম শিল্পরমম

শৌভিক রায়

গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘেরার কথা বলেছিলেন কবি। কিন্তু গোটা গ্রামকে যদি শহরে তুলে আনা যায়, তবে কেমন হয়? উত্তর লুকিয়ে হায়দ্রাবাদের শিল্পরমমে।

কে আর জানত চারদিকের আকাশছোঁয়া বহুতল, চোখ ধাঁধানো ফ্লাই ওভার, সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলা মেট্রো আর ভীষণ ব্যস্ততার এই শহরে, এরকম আস্ত একটি গ্রাম রয়েছে ! হায়দ্রাবাদ বলতে তো আমরা বুঝি গোলকুন্ডা ফোর্ট, সালার জং মিউজিয়াম, হুসেন সাগর লেক, মক্কা মসজিদ, রামোজি ফিল্ম সিটি, সাইবার সিটি, আর একমেবাদ্বিতীয়ম চারমিনার। কিন্তু আয়তনের দিক থেকে ভারতের পাঁচ নম্বর মহানগরের হাই-টেক সিটির মাঝে এরকম একটি গ্রাম থাকাও যে প্রয়োজন, সেটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে বোঝালেন শিল্পরমমের নির্মাতারা।

ক্রাফট মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, লাইব্রেরি, অডিটোরিয়াম, রিসার্চ সেন্টার ইত্যাদি সব কিছু মিলে হায়দ্রাবাদের শিল্পরমম আসলে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শিল্প ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মহানগরের কর্পোরেট দুনিয়ার

ব্যস্ততার মাঝে ৬৫ একর স্থান জুড়ে ১৯৯২ সালে এই কেন্দ্রটি নির্মিত হয়। মূল ভাবনা ছিল ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থানীয় শিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শন করা। কিন্তু নির্মাণের পর থেকে এত দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শিল্পরমম যে, সারা ভারত থেকেই এখানে ছুটে আসেন শিল্পীরা। দশেরা, মকর সংক্রান্তি, নবরাত্রি ইত্যাদি উপলক্ষে চলে শিল্প অনুষ্ঠান। উগাডি সহ দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন উৎসব ও বাৎসরিক হস্তশিল্প মেলাও শিল্পরমমের অন্যতম আকর্ষণ। রয়েছে বিভিন্ন ধরণের কর্মশালা, ট্রেনিং ক্যাম্প ইত্যাদির ব্যবস্থাও। শিল্পরমমের এম্পিথিয়েটারে মাঝেমাঝেই বসে নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য বা পুস্তক পাঠের আসর। আর এইসব আসরে অংশ নেন দেশ-বিদেশের নামি-অনামি শিল্পীরা। নাটকে `থার্ড ফর্ম` থেকে মূকাভিনয় যেমন চলে, তেমনি সঙ্গীতে শোনা যায় বিভিন্ন ঘরানা। নৃত্যের ক্ষেত্রেও ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, মণিপুরী ইত্যাদি নানা শৈলী দেখা যায়। খোলা আকাশের তলায়, মুক্ত পরিবেশে, এইসব অনুষ্ঠানের ভাগীদার হওয়া অত্যন্ত আনন্দের।

সম্পূর্ণ শিল্পরমমই টিপিক্যাল ভারতীয় গ্রামের মতো সাজানো। প্রাকৃতিক টিলা, ঝর্ণা, সবুজ গাছের সমারোহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রক মিউজিয়াম, স্কাল্পচার পার্ক, ভিলেজ মিউজিয়াম, ১৫টি প্রমাণ সাইজের কুঁড়েঘর ইত্যাদি। সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে ভিলেজ মিউজিয়ামে ঢুকলে ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কে খুব সহজেই একটি ধারণা করা যায়। এখানকার কুমোর, কামার, চাষি, কাঠুরে, ছুতোর ইত্যাদি মূর্তিগুলি এতটাই জীবন্ত যে, অনেক সময় তাদের সত্যি মানুষ ভেবে ভুল হয়ে যায়। রক মিউজিয়ামটি অনবদ্য। এই মিউজিয়ামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা। শান্তিনিকেতনের শিল্পী সুব্রত বসুর মস্তিষ্কপ্রসূত এই মিউজিয়ামে তাঁর নিজের স্থাপত্যের পাশাপাশি রয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের অসামান্য সব শিল্পকর্ম। রাজীব মন্ডলের মেটামরফোসিস, রতন সিংয়ের `ইন পারসুট অফ নলেজ`, অদিতি গর্গের 'মিস্টিরিয়াসলি অ্যাটাচড` ইত্যাদি নজরে পড়তে বাধ্য। `প্রাকৃতিক রাগা' বা লিভিং রক গ্যালারিতে

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন শিল্পকর্ম অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষিত। এই গ্যালারি দেখে অবশ্য একটু ঈর্ষা হল। হায়দ্রাবাদকে প্রকৃতি সত্যিই অকৃপণভাবে সাজিয়েছে! যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য ভাঙাচোরা জিনিস দিয়ে তৈরি ক্রাফট মিউজিয়ামটি অভিনব। যে কোনও জিনিসই যে খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায়, তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ এই মিউজিয়ামটি। অবশ্য শুধু মিউজিয়ামে নয়, ক্রাফটের সম্ভার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় সর্বত্র।

শিল্পরমমের আর্ট গ্যালারি আর লাইব্রেরি দেশের গর্ব। এমনিতেই নিজামের শহরে শিল্প সংস্কৃতির আলাদা কদর রয়েছে। অতীতে নিজামরা তো বটেই, সালার জঙের মতো আরও কিছু পরিবার শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই ধারাকেই যেন অক্ষুণ্ণ রেখেছে শিল্পরমম। পাশাপাশি ব্যবস্থা রয়েছে শিল্পসামগ্রী বিক্রয়ের। একটু দরদাম করে এখান থেকে কিনে নেওয়া যায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শাড়ি, ঘাঘরা, কুর্তা, কার্পেট কিংবা অন্যান্য দ্রব্য।

রুচি, ঐতিহ্য আর আধুনিকতার এক অদ্ভুত মিলন হল শিল্পরমম। জুবিলি ও বানজারা হিলসের হায়দ্রাবাদে এই টুকরো গ্রাম যেন মরুভূমির বুকে সেই অসাধারণ ওয়েসিস, যেখানে মেলে সত্যিকারের প্রশান্তি।

চার্বাক: ঈশ্বর অস্তিত্বহীন এক যৌক্তিক ধর্ম

নীলাঞ্জন কুমার

আমরা একটু প্রাচীনকালে গেলে দেখতে পাই ভারতীয় ধর্মের ভেতর দুধরনের ধারামত প্রবহমান। একটি ঈশ্বরবাদী দিক অর্থাৎ যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, সে ধর্ম ধারন করেন, তাদের আমরা আস্তিক বলি। অপরদিকে ঠিক উল্টো অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, বেদ মানেন না, তারা নাস্তিক। ভারতে আস্তিক ধারার প্রাবল্য বর্তমান কাল অবধি অত্যন্ত বেশি হলেও নাস্তিক ধারাটি আজ পর্যন্ত বজায় আছে ও তাই নিয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা চলে ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। আমরা দেখি চার্বাক,বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায় বেদ বিরুদ্ধ।

চার্বাক প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, যতদূর জানা যায়, এটি ঋষি বৃহস্পতির ভাবধারার দর্শন। তবে এই দর্শন বা ধর্ম যে বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধ শাস্ত্র, মহাভারত, মনুস্মৃতির ভেতরে রয়েছে, তার থেকে প্রতিভাত হয় যে এই সম্প্রদায়টির ইতিহাস এদের রচনার আগে। এখনো পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন রচনা সংগ্রহ করা যায়নি। তবে অনেকেই মনে করেন এককালে এ জাতীয় রচনা নিশ্চিত প্রচলিত ছিল এবং লোকমত

অনুসারে বলা যেতে পারে, কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধনের বিষয়টি চিন্তা করে সেই সব মূল্যবান রচনাসমূহ ধ্বংস করেছিলেন ও নানান অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিকর যুক্তির মাধ্যমে মানুষর মনকে চার্বাক দর্শন থেকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে এ কথা মনে করা যেতে পারে বৈদিক পুরোহিতদের অতি আতিশয্য ও আরামপ্রিয়তা ও মানুষকে শোষনের দিকটি প্রকট হওয়ার কারণে ভারতীয় চিন্তাজগতে চার্বাক চিন্তার বিস্তার লাভ হয়েছিল।

চার্বাক সম্পর্কিত বিভিন্ন বইপত্রের মাধ্যমে বুঝতে পারি ভারতীয় মনন ও চিন্তা জগতে এই দর্শনের আবির্ভাব সে সময় এক বৈপ্লবিক দিক। ' বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর '- এই আপ্তবাক্য সম্বল করে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দল ধর্মের নামে যে নোংরা খেলা চালাচ্ছিল তার মর্মমূলে আঘাত করেছিল এই দর্শন। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের যুক্তি বিসর্জনের প্রবণতা ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল।

আসলে বিশ্বাসহীন অস্তিত্বহীন এই চার্বাক দর্শন প্রধানত তর্কের দর্শন। আর তর্ক থেকে যুক্তির উৎপত্তি। এই দর্শন সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা যায় যে এই দর্শন কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে থাকার জন্য মাধ্যম নয়। তবে আমরা যেহেতু একটা লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলি (তা কুলক্ষ্যই হোক কিংবা সুলক্ষ্যই হোক), আর সেই লক্ষ্য আমাদের দেখিয়ে দেয় বেদ উপনিষদ ও এই ধরনের গ্রন্থগুলি। তারা লক্ষ্যসাধনমন্ত্র ছড়িয়ে একরকম লক্ষ্যের দাস বানিয়ে দেয় আমাদের যা কার্যত চার্বাক দর্শন অস্বীকার করে। কারণ এ দর্শনের ভেতর অনন্ততা লক্ষ্য করি। যা আসে তর্কের মাধ্যমে। আর এই তর্ক আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারে যা অন্য কোনো দর্শনে পাওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীন ক্রিয়াপদ্ধতির বাইরে যে বন্ধন নিহিত আছে সেই বন্ধনের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ এই দর্শন।

বৈদিক যুগের দর্শনে যে অহেতুক আবেগ আতিশয্য আমরা লক্ষ্য করি চার্বাক দর্শনে অবশ্য সামান্য হলেও কিছু আবেগী ভোগবিলাসী দিক লক্ষ্য করা যায় । তবে এই দর্শনে অন্যতম ইতিবাচক দিক 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ' এই আপ্তবাক্যটি । চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শনের প্রবক্তারা যখন তাদের গ্রন্থগুলিতে মোক্ষ ও নির্বানের বিষয় আলোচনা করেন তখন সুখের পথরোধকারী দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ উপলক্ষ্য করেই তারা অগ্রসর হয় । বলা যায় এখানেই চার্বাকের অন্যতম জয় ।

চার্বাক মতে দেহনাশের পরই জীবের যাবতীয় অস্তিত্বের অবসান ঘটে , কারণ মৃত ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে আর কখনোই পাওয়া যায় না । কাজেই মরণোত্তর আত্মার তৃপ্তি বিধানের জন্য যে সব শাস্ত্রাদি অনুষ্ঠানের কথা বেদ-এ বিধান দেওয়া আছে চার্বাক তার নানাভাবে সমালোচনা করেছে । তারা বলেন শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের মূলে ভোজন জনিত ধারণার প্রকৃত সার্থকতা যদি থাকতো তবে দূরযাত্রী পথিক কখনও খাদ্যাদি বহন করত না । গৃহের অভ্যন্তর থেকে কোন ব্যক্তি যদি তার উদ্দেশ্যে ভোজ্য উৎসর্গ করতো, তাহলে পথেই তার ক্ষুধার নির্বিত্তি হত ।

চার্বাকী গ্রন্থ 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-তে বেদকে অপৌরুষেয় বলে আখ্যা দেওয়া হয় (' অন্যে তু কুমতিমতানুসারিণো বদন্তি, বেদস্য প্রামাণ্যমন্যথা – অপৌরুষেয়ত্বেন (পৃষ্ঠা- ১১৬)। কারণ বৈদিক সাহিত্য পুরুষ বা ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয়নি । তারা বলেন পুরুষ কর্তৃক বেদের সৃষ্টির ঘটনা কোন ব্যক্তির স্মরণ না থাকার জন্য বেদ অপৌরুষেয় । চার্বাক মতে লৌকিক ব্যবহারের সঙ্গে তুলনায় বৈদিক অনুষ্ঠানের অযৌক্তিকতা এবং অর্থহীনতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করা যায় । 'প্রবোধচন্দ্রদয়' নামে একটি চার্বাকপন্থী গ্রন্থের বর্ণনায় পাই যে, যজ্ঞের সাক্ষাৎ ফল 'কর্তৃক্রিয়া দ্রব্য বিনাশ ' অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে যজ্ঞকর্তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই যজ্ঞক্রিয়া অতীতের গহ্বরে প্রবেশ করে, যজ্ঞের ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই বিনষ্ট হয়। সে অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত সব অংশ যখন ধ্বংস

প্রাপ্ত হয় তখন তার সাহায্যে যদি যজ্ঞকারীর জন্য স্বর্গদ্বার উন্মোচিত হয়, তাহলে দাবানলে বনের যাবতীয় বৃক্ষ ভস্মীভূত হবার পর সেই বিনষ্ট বৃক্ষ থেকে আমরা আশানুরূপ ফল আশা করতেই পারি । বেদমতে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুকে বলি দেওয়া হয় সেই পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে । বৃহস্পতি বচনে এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো হয় যে, পশুবলির যদি এই প্রকৃত কারণ হয়, তবে যজমান পশুর পরিবর্তে নিজ পিতাকে যজ্ঞের বলি হিসেবে মনোনীত করতে পারে। তাতে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি অন্য পদ্ধতির তুলনায় এই উপায়ে অনেক সহজ হয়ে যাবে।

আমরা আরো দেখি, 'বিষ্ণু পুরাণ'-এ বেদ ও বৈদিক যাগযজ্ঞের নিন্দা ও পশুবলির বিরোধিতা করা হয়েছে। এই পুরাণ বলে বেদের এ বিধান 'বালকের বচন'। বিষ্ণু পুরাণে এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, বেদের এই নির্দেশ দেবতাদের পশু অপেক্ষাও হীন প্রতিপন্ন করে। তাছাড়া এ জাতীয় অশ্লীল আচারের যাঁরা বিধান দেন বৃহস্পতি বচনে তাদের 'ভন্ড' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে (' অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নং তু প্রত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্তিতম। ভন্ডৈস্তদ্বৎ পরং চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্তিতম।।)। এছাড়া বেদ ও বেদানুসারী ধর্মশাস্ত্রগুলিতে আমরা নানাভাবে ব্রহ্মচর্যের বিধান পাই। যার প্রধান লক্ষ্য মানুষের উচ্ছৃঙ্খল কামপ্রবৃত্তি সংযত করা। চার্বাক মতে বৈদিক দেবতা ও শাস্ত্রকারদের ব্যক্তিগত চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আমরা ধর্মগ্রন্থগুলিতে পাই। ব্রাহ্মণদের ক্রোধ দমন করার অনেক উপদেশ দেওয়া আছে ধর্মশাস্ত্রে কিন্তু বাস্তবে ব্রাহ্মণদের আচরণে ক্রোধ ও অভিশাপ দেওয়ার কুৎসিৎ স্বভাব কার্যত বেদেরই বিরোধীতা করে। চার্বাকপন্থীরা এদের উপদেশ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের নিজের রুচিমতো জীবন যাপন করার কথা বলেন। তাছাড়া যে যাজক শ্রেণীর লোকেরা 'ব্রাহ্মণের'যোগে দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, চার্বাক দর্শনে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। চার্বাক মতে এরা বুদ্ধি ও পৌরুষবিহীন। এ কারণে জীবিকার অন্য কিছু উপায় না করতে পেরে নানা প্রতারণার আশ্রয়

নিয়েছেন। বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা যে মোহজাল সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের ওপর, চার্বাক তার তীব্র নিন্দা করেছেন।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, চার্বাকপন্থীদের গ্রন্থাবলী ও মতামত যতই গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ধ্বংস করুক না কেন, সে ধারা রয়ে গেছে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মাধ্যমে। চার্বাকীয় নীতিবোধ নিয়ে ব্রাহ্মণকুল বহু কুৎসা প্রচারিত করেছে। তার ভেতর 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' (ঋণ করে ঘি খাও) *অন্যতম। যে সব নীতিবোধের ইঙ্গিত চার্বাক দর্শন দিয়েছে নানা কুৎসার কারণে ও তার ব্যাপক অংশ ধ্বংসের কারণে সে সবের তেমন প্রমাণ আজ আর দেওয়া সম্ভব নয়। তার ফলে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ বা জড়বাদের ঐতিহ্য বহুলাংশে অবহেলিত, আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের ঐতিহ্যও রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে।*

তথ্য স্বীকার:

১। চার্বাক দর্শন। লতিকা চট্টোপাধ্যায়। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯।

২। ভারতীয় দর্শন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি, কলকাতা ৭৩।

মায়া অ্যাঞ্জেলু (আমেরিকান কবি)

শংকর ব্রহ্ম

এ'বছর (২০২২ সালে) যুক্তরাষ্ট্রের নতুন মুদ্রায় স্থান দেওয়া হয়েছে কবি ও নারী অধিকারকর্মী মায়া অ্যাঞ্জেলুকে। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পঁচিশ সেন্টের এই মুদ্রায় ঠাঁই পেলেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের দপ্তর ইউ.এস.মিন্ট ১১ই জানুয়ারী (২০২২) জানিয়েছে, সিকি মুদ্রার নতুন সংস্করণে কবি মায়া অ্যাঞ্জেলুকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

সেন্ট লুইসে ২৪শে এপ্রিল, ১৯২৮ সালে মার্গারেট অ্যান জনসন (মায়া অ্যাঞ্জেলো) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বেইলি জনসন নৌ ডায়েটিয়ান ছিলেন।

তাঁর মা ভিভিয়ান বেক্স্‌টার জনসন একজন নার্স এবং কার্ড ডিলার ছিলেন। তাঁর বড় ভাই, বেইলি জুনিয়র তাঁর ডাক নাম দিয়েছিলেন 'অ্যাঞ্জেলু'।

যখন অ্যাঞ্জেলুর তিন বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়। তাকে ও তাঁর ভাইকে তাদের পিসির সঙ্গে বাস করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

চারবছর পর, অ্যাঞ্জেলু ও তাঁর ভাই সেন্ট লয়েসকে মায়ের সঙ্গে বাস করার জন্য আবার নিয়ে আসা হয়েছিল। তার মার সঙ্গে থাকার সময়, অ্যাঞ্জেলু তার মায়ের প্রেমিক দ্বারা ধর্ষিত হন। তা তার ভাইকে জানাবার পর, তার

ভাইয়ের প্রচেষ্টায় তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং রহস্যজনক ভাবে তার মুক্তির আগে তাকে হত্যা করা হয়। কি কারণে তা জানা যায়নি।

আবার চোদ্দ বছর বয়সে অ্যাঞ্জেলু ক্যালিফোর্নিয়াতে তাঁর মায়ের সাথে বাস করতে গেলেন। অ্যাঞ্জেলু জর্জ ওয়াশিংটন হাই স্কুল থেকে স্নাতক হন। সতেরো বছর বয়সে অ্যাঞ্জেলু তাঁর ছেলে গোগাকে জন্ম দিয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো মায়া অ্যাঞ্জেলুর 'আই নো হোয়াই দ্যা ক্লোজড বার্ড সিংস' আত্মজীবনীটি। জিম ক্র যুগের সময় আফ্রিকান-আমেরিকার একটি মেয়ে হিসাবে তাঁর বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন সেখানে তিনি।

মূল ধারার পাঠকবর্গের কাছে আবেদন করার জন্য একটি আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলা সমিতি কর্তৃক আহ্বানে লিখিত লেখাগুলির মধ্যে প্রথমটি ছিল তাঁর এই লেখাটি।

তিনি একজন নাগরিক অধিকারকর্মী, এবং লেখক হিসাবে ক্যারিয়ার শুরু করেন।

অ্যাঞ্জেলু ১৯৫০ সালের শুরুতে আধুনিক নাচ ক্লাস শুরু করেন। নর্তকী এবং কোরিওগ্রাফার অ্যালভিন এলি-র সাথে কাজ করেন, সান ফ্রান্সিসকো জুড়ে "আল এবং রিতা" আফ্রিকান-আমেরিকান ভ্রাতৃত্বিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অভিনয় করেন। ১৯৫১ সালে, অ্যাঞ্জেলু তাঁর ছেলে এবং তার স্বামী তোশ এঞ্জেলসকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটিতে চলে যান যাতে তাঁর সন্তান পড়াশোনা করতে পারেন। পার্ল প্রিমাস এর সাথে আফ্রিকান নাচ করেন সেখানে।

১৯৫৪ সালে, অ্যাঞ্জেলুর আবার বিয়ে হয় এবং তিনি সান ফ্রান্সিসকো জুড়ে পারফরম্যান্সের স্থানগুলিতে নাচতে শুরু করেন। 'বেগুনি পেঁয়াজ'-এ (The nightclub 'The Purple Onion') যখন তিনি ক্যালিপসো মিউজিকের সঙ্গে নাচ ও গান দুইই করা শুরু করলেন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন, তখন সেখানকার ম্যানেজার ও তাঁর ভক্তদের পরামর্শে তিনি তাঁর নাচের পেশায় এযাবৎ ব্যবহৃত নাম 'রিতা' ও 'মার্গারিটা' পরিবর্তন করে 'মায়া অ্যাঞ্জেলো' ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। এই পরিবর্তন তাঁর নামকে একটি আকর্ষনীয় বিশিষ্টতা দেয়।

১৯৫৯ সালে, অ্যাঞ্জেলু বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জন অলিভার কিলেন্সের সঙ্গে পরিচিত হন, যিনি তাকে একজন লেখক হিসেবে তার দক্ষতা নির্ণয় করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে ঢুকে, অ্যাঞ্জেলো হারলেম রাইটার্স গিল্ডে যোগ দেন এবং তার কাজ প্রকাশ করতে শুরু করেন।

পরের বছর, অ্যাঞ্জেলো ডাঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং সাউথ খ্রিস্টান লিডারশিপ কনফারেন্সের (এস.সি.এল.সি) জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ফ্রিডম বেনিফিটের ক্যাবারেট সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেন। শীঘ্রই তিনি, Angelou SCLC এর উত্তর সমন্বয়ক হিসাবে নিযুক্ত হন।

পরের বছর, অ্যাঞ্জেলো দক্ষিণ আফ্রিকার সক্রিয় কর্মী ভুসামজি মাকির সাথে রোমান্টিকভাবে জড়িত হন এবং কায়রোতে চলে যান। অ্যাঞ্জেলো আরব পর্যবেক্ষকের সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৬২ সালে অ্যাঞ্জেলো ঘানার 'ইউনিভার্সিটি অব ঘানা-তে চাকরি করেন। অ্যাঞ্জেলো একজন লেখক হিসাবে তার নৈপুণ্যকে ব্যবহার করে ঘুরে বেড়াতে থাকেন, আফ্রিকান রিভিউ এর জন্য একজন বিশিষ্ট সম্পাদক,

ঘানিয়ান টাইমসের ফ্রিল্যান্সার এবং রেডিও ঘানার রেডিও ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করেন।

ঘানাতে বসবাসকালে, অ্যাঞ্জেলু আফ্রিকান-আমেরিকান প্রবাসী সম্প্রদায়ের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন। এখানে তাঁর ম্যালকম এক্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

তিনি ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে অ্যাফ্রো আমেরিকান একতা সংস্থার বিকাশে সাহায্য করেন। যাই হোক, সংস্থা সত্যিই কাজ শুরু করার আগেই ম্যালকম এক্সকে হত্যা করা হয়।

তিনি আবার ফেরেন লেখার পৃথিবীতে এবং "ব্ল্যাকস, ব্লুজ, ব্ল্যাক" নামে একটি দশ এপিসোডের ডকুমেন্টারি টিভি সিরিস প্রকাশ করেন তিনি।

১৯৬৯ সালে তাঁর আত্মজীবনী, 'I Know Why the Caged Bird Sings' প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এই আত্মজীবনী আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসা লাভ করে। চার বছর পর, অ্যাঞ্জেলু প্রকাশ করেন ' Gather Together in My Name' যা একক মাতৃত্বের অধিকারিনী এক নারীর ক্রমাগত দারিদ্র্য ও অপরাধের পৃথিবীতে নেমে আসার ছবিটিকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করে। ১৯৭৬ সালে, "Singin' and Swingin' And Getting Merry Like Christmas" প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮১ সালে 'The Heart of Woman' ও পরবর্তীতে ' All God's Children Need Travelling Shoes' (১৯৮৬), ' A Song Flung Up to Heaven (২০০২) এবং ' Mom And Me And Mom' (২০১৩) প্রকাশিত হয়।

তার আত্মজীবনীমূলক সিরিজ প্রকাশ ছাড়াও, অ্যাঞ্জেলু ১৯৭২ সালে সুইডিশ আমেরিকান নাট্য চলচ্চিত্র 'জর্জিয়া' তৈরী করেন।

পরের বছর (১৯৭৩ সালে) ব্রডওয়ে নাটক 'Look Away'তে তাঁর ভূমিকার জন্য টনি অ্যাওয়ার্ড পান। ১৯৭৭ সালে, অ্যাঞ্জেলু টেলিভিশন মিনি সিরিজ 'রুটস'-এ 'নাইও বোটো'র ভূমিকায় অভিনয় করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৯৮১ সালে, অ্যাঞ্জেলো অ্যায়েক ফরেস্ট ইউনিভাসিটির আমেরিকান স্টাডিজের রেনল্ডস প্রফেসর অভিধায় ভূষিত হন।

১৯৯৩ সালে বিল ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অ্যাঞ্জেলো "অন পালস অফ মর্নিং" কবিতা আবৃত্তি করেন।

২০১০ সালে অ্যাঞ্জেলো তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী 'Black Culture'-এর গবেষণা জন্য স্কোম্বার্গ সেন্টারে দান করেন।

পরের বছর (২০১১) প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'Presidential Medal Freedom প্রদান করেন অ্যাঞ্জেলোকে।

গত বছর (১১ই জানুয়ারী, ২০২২) কবি ও নারীঅধিকারকর্মী মায়া অ্যাঞ্জেলুকে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পঁচিশ-সেন্টের মুদ্রায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই এটা যে কোন দেশের কবির পক্ষেই একটা বড় সম্মান প্রাপ্তি।

তথ্য স্বীকার: উইকিপেডিয়া ও আন্যান্য অনলাইন সাইট ও বিভিন্ন পত্র-পাত্রিকা

ভুল

সুব্রত নন্দী

দিন কয়েক আগের ঘটনা। আমার পরিচিত একজন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি প্রশ্ন পাঠালো : " 'ভুল' বানানটা 'ভূল' না 'ভূল' বানানটা 'ভুল'?" এই অদ্ভুত প্রশ্নে প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেলাম, পরে সেটি বাংলার এক মাস্টারমশাই এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম সঠিক উত্তরের জন্য। ওনার রসসিক্ত উত্তর: " 'ভুল' বানানটা যেন 'ভূল' না হয়"। আমার এই উপাখ্যানের বিষয় কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ বা বাংলা বানানবিধি নয়। এই বিষয়ে আমার জ্ঞান আমার হিন্দি জ্ঞানের সমতুল্য।

জীবনে কখনো ভুল করেননি, এমন মানুষ বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কমবেশি ভুল সবারই হয়েই থাকে। এই ধরুন, শীতকালে জমিয়ে বেগুন পোড়া বা ভাজা খাবার জন্য খান পাঁচেক নধর সাইজের বেগুন কিনে আনলেন, তার একটি-দুটিতে পোকা বেরোলো কিংবা টক; অথবা, ঝাল খাবার জন্য বাজার থেকে শ-পাঁচেক চুনো মাছ না বাছিয়ে বাড়িতে আনলেন- অর্ধাঙ্গিনীর কাছে এই ভুলের খেসারত দিতে হয় নি এমন পুরুষমানুষ বোধহয় বিরলতম! সৈয়দ মুজতবা আলী মহাশয়ের " বিয়ের প্রথম রাতে মারিবে বিড়াল, না হলে বরবাদ সব, তাবৎ পয়মাল" এই অসামান্য উক্তিটি না শুনে যাঁরা বিয়ের প্রথম দিকে অর্ধাঙ্গিনীর কষ্টের কথা চিন্তা করে মশারি খাটানো , নিজের জামা-প্যান্ট কাচা, ইত্যাদি ইত্যাদি

কাজ করেন , সারা জীবন ধরেই (অথর্ব না হওয়া অবধি) এই ভুলের খেসারত দিয়ে যান।

ধরুন, ছাত্রজীবনে আপনার প্রাণের বন্ধুকে অনেক গোপন কথা বলেছিলেন। কিন্তু ওই যে রবিঠাকুরের গান আছে না "গোপন কথাটি রবে না গোপনে..."। যথারীতি গোপন কথাটি বন্ধুদের মধ্যে বেরিয়ে গেলো, আর আপনি বন্ধুদের কাছে হাসির খোরাক হলেন। এই ধরনের বন্ধু সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় গৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের একটি মজার উক্তি আছে "এই রকম দু-একটা বন্ধু থাকলে শত্রুর দরকার হবে না।" গোপন কথা পেট থেকে বার করার ভুলের খেসারত কিঞ্চিৎ কমবেশি অনেকেই দিয়েছেন। এই সমস্যা শুধু যে বন্ধুমহলে হবে, তা নয়; পরিবারে, পাড়া পড়শি, কর্মক্ষেত্রে- যে কোনো জায়গায় হতে পারে। তাই, সাধু সাবধান!

ভোজবাড়িতে অপরিমিত খাবার ভুল কমবেশি অনেকেরই হয়। ফলতঃ সেই রাতে প্রাণান্তকর অবস্থা, পরের দিন সকাল পর্যন্ত কষ্টের সীমা থাকে না। ভোজবাড়িতে খেলে আমার এরকমই অবস্থা প্রায়শই হয়। সেই অবস্থার কথা এক ভোজনরসিক বন্ধুকে বলতেই সে বললো ব্যাকরণ না মেনে খেলে তো এরকম হবেই। সেই স্কুল থেকে ব্যাকরণ শুরু হয়েছে, জীবনের সব অধ্যায়ের সঙ্গে ভোজনেরও যে ব্যাকরণ আছে তা কে জানতো? ওর ভোজবাড়ির খাওয়ার ব্যাকরণ এর গপ্পো বলার আগে আপনাদের ওই বন্ধুর সঙ্গে একটু ছোট্ট করে পরিচয় করিয়ে দিই। ওই বন্ধুটির ওজন এক কুইন্টালের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। কখনও এক কুইন্টাল থেকে ২ কেজি কম , কখনও ২ কেজি বেশি। ওজন যাই হোক কিন্তু একদম ফিট। ভোজবাড়িতে কিভাবে খেতে হয় তার ব্যাকরণ ওর ভাষাতেই বলি :
"সকাল থেকে খাদ্যতালিকায় থাকবে লিকার চা-মেরি বিস্কুট, মুড়ি, দুপুরে ঝিঙে-বেগুন-বড়ির পাতলা ঝোল আর অল্প ইট্টুখানি ভাত। পেট খালিও নয়, আবার ভর্তিও নয়।

নেমন্তন্ন বাড়িতে সন্ধের সময় পেট খালি, কিন্তু ভুলেও চিকেন পকোড়া, জিলিপি, ফুচকার দিকে তাকাবি না (ওগুলো ক্যাটারারের কায়দা, যাতে কম মূল খাবার খাওয়া হয়। ওগুলো পেটে আগেভাগে ঢুকে জায়গা দখল করে নেবে।

একটু মুখ দেখিয়ে হেঁ-হেঁ করে সোজা চলে যাবি খাওয়ার জায়গায়। খেতে বসবি অপরিচিত লোকের সঙ্গে। মনে রাখবি, তুই এসেছিস খেতে, খোশগপ্পো করতে নয়। পরিচিত লোক খেতে বসে খেজুরে গপ্পো করবে। তাতে তোর উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হবে।

মেনু তুই জেনে গেছিস। তা-ও একবার মেনু কার্ডে চোখ বুলিয়ে নিস। গোড়ার দিকের আইটেম বেশি নৈব নৈব চ। মাছ নিশ্চয়ই তোর হবে প্রথম টার্গেট। ফ্রাই হোক বা ফিঙ্গার, পাতুরি হোক বা কোফতা- এবার তুই ক্ষুধার্ত বাঘ। ঝাঁপিয়ে পড় সর্বশক্তি দিয়ে। তবে গোগ্রাসে নয়। ধীরে ধীরে। এর পরে পোলাও, বিরিয়ানির পালা এবং অবশ্যই মাংসের। শেষে খান দশেক মিষ্টি।"

একবার ভোজবাড়ির খাওয়ার দিন ওর প্রেসক্রিপশন মেনে সকাল থেকে কাটালাম। যখন সন্ধ্যে হলো তখন দেখি খালি পেটে থাকার জন্য আমার শর্করার স্তর অনেক নেমে গেছে। ভোজবাড়ির খাওয়া মাথায় উঠলো। জীবনের অনেক ভুলের মধ্যে আরেকটা ভুল বুঝলাম যে সব ওষুধ সবার জন্য নয়।

অনেক বিষয়েই আমরা অনেককে বিশেষজ্ঞ বলে ধরে নিই। অনেক ক্ষেত্রেই যাকে আমরা কোনো বিষয়ে অথরিটি বলে ধরে নিয়েছি, পরে দেখা গিয়েছে সেই বিষয়ে তিনি প্রকৃত হস্তিমূর্খ। দশচক্রে ভগবান যেমন ভূত হয় তেমনি ওই বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিও বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত হন। হয়তো

তিনি অন্য বিষয়ে পণ্ডিত মানুষ। আসলে ভুল আমাদেরই, কারণ অনেক সময়েই আমাদের ধারণা- যিনি ভালো রসগোল্লা তৈরি করতে পারেন, তিনি অবশ্যই ভালো বিরিয়ানিও তৈরি করতে পারবেন।

ভুলে ভরা, হেঁয়ালি ও ধাঁধাপূর্ণ জীবনে ঠিক-ভুলের বিচার করে কোনও লাভ নেই, তার থেকে বরং আর আর একটা ভুলের গপ্পো শোনাই।

বিবাহ নিয়ে বহুশ্রুত সবার জানা একটি প্রবচন আছে: দিল্লিকা লাড্ডু যো খায়া ও পস্তায়া, যো নেহি খায়া ও ভি পস্তায়া। এই প্রবচনের ঠিক-ভুল বিচারের ভার রসিক পাঠককুলের উপর রেখে গুরু তারাপদ রায়ের একটি গল্পের অংশ শুনিয়ে এই উপাখ্যানটি শেষ করছি।
" বাবা ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছেন। মাঠে একটা ভেড়া চড়ছে। ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, ' বাবা, এটা কী?'
বাবা বললেন, 'এটা হল ভেড়া।'
ছেলে একটু পরে আরেকটা ভেড়া দেখিয়ে বললো, 'বাবা, ওটা কী?'
বাবা বললেন, 'ওটাও ভেড়া। '
ছেলে বললো , ' বাবা , দুটোই ভেড়া?'
বাবা এবার একটু কায়দা করে বললেন, 'একটা হল ভেড়া, আর একটা ভেড়ার বৌ।'
ছেলে বললো, 'বাবা, ভেড়ারা বিয়ে করে ?'
বাবা বললেন, 'হ্যাঁ করে। ভেড়ারাই শুধু বিয়ে করে।' "

অবশেষে

ভুবন সরকার

অবশেষে আশঙ্কাই সত্যি হলো।
অফিসে বসেই সত্য খবরটা পায় ফোনে।
চকিতে চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসে। দীর্ঘ তেরো বছরের কর্মজীবনের এক ফোনেই পরিসমাপ্তি! কথাটা মাথার ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয় বারবার- ‘আপনি আমাদের খুবই বিশ্বস্ত ও পুরাতন কর্মী। ইতিপূর্বে আপনার নামে এমন কোন অভিযোগ আমরা পাইনি । তাই আপনাকে আমরা একটা সুযোগ দিতে চাই অন্যত্র কাজে যোগদানের । আপনি এই মুহূর্তে স্বেচ্ছা পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করতে পারেন। অন্যথায় আমরা আপনাকে সাসপেন্ড করতে বাধ্য হব। আর সেটা আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সুখকর হবেনা। সিদ্ধান্ত আপনাকে বিকেল চারটার আগেই জানাতে হবে’।
অনেক ভেবে চিন্তে রেজিগনেশন লেটারটা মেইলে পাঠিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সত্য। একজন সহকর্মী এগিয়ে এসে জলের গ্লাসটা তুলে ধরে বলে- ‘কি হলো, শরীর খারাপ লাগছে স্যার?’
নিঃশব্দে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায় সত্য।
মাথাটা ঝিমঝিম করছে। গলা শুকিয়ে আসছে। বুকের ভিতরে অপার শূন্যতা। কি করবে ভেবে পায় না সত্য। সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে আজ বড্ড অসহায় মনে হচ্ছে।
কর্পোরেট অফিসে উঁচু পদে কাজ করে সত্য। শুরুতে সেলস এক্সিকিউটিভ। এখন সহকারী ম্যানেজার। নিজের কর্ম-কুশলতার পুরস্কার।

সহকর্মীদের মাঝে কয়েকজন মহিলাও আছেন। যেহেতু কর্পোরেট অফিস, সেহেতু ছোট থেকে বড় সবার উপর কাজের চাপও যথেষ্ট। কাজের প্রয়োজনে কখনো কখনো সহকর্মীদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করে কাজ আদায় করতে হয়। নারী পুরুষ সমানাধিকার।

মিস রাধা ভিন রাজ্য থেকে আসা কর্মী। বিদেশ বিভুঁইয়ে একা একা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। ফলে কাজের গতি কিছুটা শিথিল হওয়ায় অফিসের বস ও ডেপুটি বস তাকে চেম্বারে ডেকে কড়া কথা শোনায়।
এটাই দস্তুর। বিষয়টা নিয়ে মিস রাধা বেশ বেকায়দায় পড়ে যায়। নিজের কাজের কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে চাকরী রাখা কষ্টকর সে কথা পরিস্কার বুঝতে পারেন।
করোনা জনিত কারণে মার্কেটের অবস্থা শোচনীয়। এই বাজারে অফিসের বসের রক্তচক্ষু দেখা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।
বিষয়টি অফিসের সকলের জানা। সামান্য কর্মশিথিলতায় এহেন অবস্থার মুখামুখি সবাইকেই একদিন দাঁড়াতে হয়।
নিজেকে সুরক্ষিত করার কৌশল খুঁজে রাধা। আর সে কৌশলে কারও পরামর্শে মহড়া বানায় সত্যকেই।

কিছুদিন ধরে সত্য অনুমান করতে পারছে তার ঠিক পিছে তাকে নিয়ে কিছু একটা আলোচনা চলে অফিসে।
সহকর্মীরা অনেকেই বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু কিছুতেই বিষয়টা জানতে পারছে না সত্য।

সেদিন অফিসে আসার সাথে সাথেই বস তাকে ডেকে পাঠায়। বসের চোখ মুখ দেখে প্রমাদ গোণে সত্য।
বস বলে- 'তুমি তোমার মেইল চেক করেছো সত্য'।
- 'না'।

- মেইলটা চেক কর।

সত্য নিজের টেবিলে এসে মেইলটা খুলে বসে।

মেইলটা দেখে সত্য আকাশ থেকে পড়ে।

সে দ্রুত বসের চেম্বারে ঢোকে। চোখে মুখে উদ্বিগ্নতা।

- এসব কি বস?

- আমিও তাই ভাবছি। তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছে রাধা। পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়েছে। যারা বিষয়টি তদন্ত করবেন। মিস রাধা এক মাসের সবেতন ছুটিতে বাড়িতে থাকবেন।

কথা শেষ হতে না হতেই সত্যর পকেটে ফোন বেজে উঠে।

সেন্ট্রাল অফিস থেকে ফোন। কিছু সময়ের মধ্যে পুরো তদন্ত কমিটির মুখামুখি হতে হবে ভার্চুয়ালি তাকে। বস মিঃ ঘোষ সত্যকে চেম্বারে বসিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কিছু সময়ের মধ্যে সত্যকে কানেক্ট করা হলো। উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি। পাঁচ সদস্যের তিনজন মহিলা, দুজন পুরুষ।

- মিঃ রয়, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি বিগত ২৪-শে অক্টোবর ২০২১ অফিসের স্ট্রং রুমে মিস রাধাকে যৌন হয়রানি করেছেন। যেমন- গায়ে হাত দেয়া বা দেবার চেষ্টা, অশ্লীল ইশারা বা ইঙ্গিত করা। তাকে ট্রান্সফারে সহায়তা করার শর্তে যৌন সাহচর্যের দাবি বা অনুরোধ।

- না ম্যাম। কেন আমার বিরুদ্ধে মিস রাধা এমন একটা অভিযোগ আনলেন তাই তো আমি বুঝতে পারছি না।

অন্য একজন ম্যাম প্রশ্ন করলেন- আপনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?

মাথাটা যন্ত্রনায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। বুকের ভেতর কেবল শূন্যতা।

- আপনি কি মনে করেন আপনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্যি?

- সর্বৈব মিথ্যে ম্যাম। এমন কোন ঘটনা আমি মিস রাধার সঙ্গে কেন, কারো সঙ্গেই কোন দিন করিনি।

- আপনাকে যা প্রশ্ন করা হবে তার উত্তর 'হ্যাঁ' অথবা 'না'তে দিতে হবে।

- অভিযোগে মিস যে জায়গার উল্লেখ করেছেন সেই জায়গাটি কি সি সি ক্যামেরার এলাকাধীন?
- না স্যার। তবে ষ্টং রুমের বাইরের ক্যামেরা থেকে ভিতরের চালচলন কিছুটা বোঝা যায়।
- আপনাকে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' তে জবাব দিতে বলা হয়েছে।
- আপনি এবং মিস রাধা উল্লেখিত দিনে এক সঙ্গে ষ্ট্রং রুমে গিয়েছিলেন।
- হ্যাঁ ম্যাম, অফিসের কাজের প্রয়োজনে।
- কতবার গিয়েছিলেন?
- সম্ভবত একবার ম্যাম।
- সেখানে আপনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে যৌন হেনস্তা করেছিলেন?
- না ম্যাম। আমি বিবাহিত। বাড়িতে আমার স্ত্রী, কন্যা...
- জবাব 'হ্যাঁ' বা 'না'তে।

এমন একটা মিথ্যে সঙ্গীন অভিযোগের উত্তর একটি মাত্র শব্দে? অফিসের কর্মব্যস্ত সময়ে এতোগুলো সহকর্মীর উপস্থিতিতে একজন অধঃস্তন মহিলা সহকর্মীর যৌন হেনস্তা?

দীর্ঘ সময় ধরে একের পর এক নানা প্রশ্নে জর্জরিত সত্য এসির ভিতরেও দরদর করে ঘামছে। এতক্ষণকার প্রশ্নগুলো মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে। বুকের ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে যাওয়া কান্নাকে আটকাবার মুখ চেপে চেষ্টা করে সে।

বস মিঃ ঘোষ এমন সময় ভিতরে আসেন। নিজের আসনে বসতে বসতে বলেন- 'কি হলো?'

সত্য সবিস্তারে সব জানালেন। ইতিমধ্যে অফিসের অনেকেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে বসের চেম্বারের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা অনুমানের চেষ্টা করছেন।

বিকেলের মধ্যে সমস্ত অফিসে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ এগিয়ে এসে সহানুভূতি প্রকাশ করে গেলেন। ভার্চুয়াল ইনভেষ্টিগেসনের যাবতীয় প্রশ্নোত্তর লিখিত আকারে তাকে পাঠিনো হবে সেই সাথে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ। কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

বস মিঃ ঘোষকে ২৪ শে অক্টোবরের সি সি ক্যামেরা ফুটেজ দেখার দাবি জানায় সত্য।
দুজনে বসে ফুটেজ দেখেন সেই দিনের। সারা দিনের ফুটেজে এমন কি স্ট্রং রুম থেকে বেরিয়ে আসার ফুটেজে কোথাও মিস রাধাকে অসহায়ভাবে ভারাক্রান্ত মনে দেখা যায়নি। যৌন হেনস্থার শিকার একজন মহিলা কর্মী বরাবরের মতোই ছিলেন প্রাণোচ্ছল। অভিযোগ জানাবার মত সহকর্মী বা বস কারো কাছেই কোন খবরবিহীন এমন একটা গুরুতর অভিযোগ!
অনেক রাতে বাড়ি ফেরে সত্য। কয়েক জোড়া উদ্বিগ্ন চোখে অপার অসহায়তা সত্য লক্ষ করে। হাত মুখ ধুয়ে বসার ঘরে সোফাতে গা এলিয়ে দেয়। মা এসে সামনে দাঁড়ায়- কি হবে সত্য? সত্য কোন উত্তর করতে পারে না।
চোখের সামনে খবরের কাগজটা মেলে ধরে নিজের চোখের জলকে আড়াল করে। বহু কষ্টে বলে- জানি না মা।
অদ্ভুত একটা যন্ত্রনা বুকের মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠে।

প্রতিটা দিন নিদারুণ উৎকন্ঠা। কি হয়, কি হয়। সহকর্মী বন্ধুদের আশার আলোচনায় নিজেকে বড় ছোট মনে হয়।
অভ্যন্তরীণ সমস্ত তদন্ত শেষে অবশেষে তিন মাসের মাথায় কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটির ফোন আসে।
মিস রাধা তার বাড়ির কাছে এক শাখায় ট্রান্সফার পেয়ে জয়েন করেছেন। আর একজন মহিলা সহকর্মীর আনিত অভিযোগের উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ না পেলেও বেনিফিট অব ডাউটে ....।
পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। দীর্ঘক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে সত্য। বস মিঃ ঘোষ এসে পিঠে হাত রেখে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে। তার দু' চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

মুখ তুলে কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছেনা সত্য।

ব্যাগটা কাঁধে তুলে নেয়। তারপর অফিসে সদা উঁচুতে রাখা মাথাটা নিচু করেই অফিস থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে সে। দুচোখ দিয়ে জল গড়ায় তার। ঝাপসা চোখের দৃষ্টির মাঝে অনেকগুলো নিরপরাধ অসহায় মুখ তার চোখের সামনে - বাবা মা বোন স্ত্রী কন্যা।

বেঁচে থাকা এক জীবনের কাহিনী

অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

'কি...গো...! ওঠো না তাড়াতাড়ি। কত্তো বেলা হলো ! সকাল থেকে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছো। আর ভাল্ লাগছে না একদম'। কথাগুলো বলেই তাপসী সজোরে ধাক্কা দিল সুদীপ্তকে।
"ও...হো...! কি হলো কি ! সক্কাল থেকে শুরু হলো খ্যাচর খ্যাচর !এই তো সবে ঘুমোলাম।" ঘুম জড়ানো গলায় কথাগুলো বলে পাশ ফিরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয সুদীপ্ত।
"মরণ! বুড়ো বয়সে ফেসবুক করে, আরো কি সব করে ভোর রাতে উনি ঘুমোবেন, আর উঠবেন বেলা এগারটায়। অসহ্য। " কথাগুলো বলতে বলতে তাপসী রান্নাঘরে এসে এ কৌটো ও কৌটো খুঁজে চালের গুড়ো বের করল। খেজুরগুড় দিয়ে পাটিশাপটা তৈরি করে রাখবে ছেলের জন্য।

অতনু অনেক বছর বাদে বাডিতে আসছে৷ তাপসী প্রায় দশদিন ধরে নানা রকম খাবার তৈরি করছে ছেলের জন্য৷ তার মধ্যে রযেছে বিভিন্ন রকমের আচার, জ্যাম, জেলি, পাপড়, গুজিয়া-ভুজিয়া, খাজা-গজা আরো যে কত কি বানিয়েছে। ছেলে খেয়ে শেষ করতে পারবে বলে ম...

আতনু বিয়ে করেছে কানাডিয়ান একটি মেয়েকে। অবশ্য ওরা দুটিতে ভালোই আছে। দুজনেই ভালো ইনকাম করে। বাস্ততার জীবন ওদের-তবুও দিনে একাবার হলেও বাবা-মায়ের খোঁজ খবর নিতে ভুলে যায় না। সেই হৃদয়ের ধন আসছে সাত বছর বাদে। তাই তো তাপসী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। সুদীপ্তবাবু কিন্তু বারবার বলে চলেছেন, "এত্ত বাড়াবাড়ি কোরো না ! বাবু আগে সুস্থ মতো বাড়িতে আসুক, তারপরে যা যা ইচ্ছে কোরো। তাপসী ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে নি। মায়ের মন বলে কথা। কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবু আবার একা আসছে না, সঙ্গে আবার আদরের বৌমাও আসছে। তাই এত্ত এত্ত আয়োজন চলছে। হাতেগোনা কয়েকটা দিন থাকবে ওরা। এরপর আবার কবে আসতে পারবে, কে জানে। আর দেখা হবে কিনা এসব নানান চিন্তা মাথায় ঘোরপাক খায় সবসময়। সুদীপ্ত মাঝে মাঝে খুব অসুস্থ হয়ে পড়চ্ছে। ভালো মতো চিকিৎসা করাতে হবে। বাবু ছাড়া আর কে আছে যে এসব দায়িত্ব নিতে পারবে। শেষ বয়সে এসে ছেলেকে কাছে পেতে চায় পৃথিবীর সব বাবা-মা। আর দুদিন বাদেই অতনুর ফ্লাইট । আজ বুধবার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী শুক্রবার সকালে রওনা দিয়ে প্রথমে দিল্লি, তারপর ফ্লাইট চেঞ্জ করে আর এক ফ্লাইট ধরে বাড়ি। তাপসী ভাবে কত যে যোজন মাইল দূরে থাকে বাবুটা। কোনো কিছু একটা হলে আসতে পারবে না কিছুতেই। কপালে যে কি লেখা আছে কে জানে। দুজনেরই বয়স হচ্ছে। একমাত্র অবলম্বন সেও থাকে না। তাপসী ঠিক করেছে, এবার বাবুকে বলবে দেশে ফিরে আসতে। আপন মনে কাজ করতে করতে তাপসী বিড়বিড় করে বলতে থাকে, "অনেক দিন তো হল বিদেশে থাকা; এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেই তো ভালো হয়। আজকাল বিদেশে যাওয়াটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ তো আবার বিদেশিনী নিয়ে সারা জীবন কাটাবে বলে ঠিক করেছে। তা নিজের যা ইচ্ছে করুক গে। বাপ-মাকে শেষ বয়সে একটু দেখেশুনে রাখিস বাবা, এর থেকে আর বেশি কিছু আমরা তোমার কাছে চাই না। বাবাতো এখন একটা লাঠি ধরেছে, আমারও সময় এল বলে। কত সাধ ছিল পাড়া-প্রতিবেশিকে সাথে নিয়ে ছেলের ধুমধাম করে বিয়ে দেবো;

কপালে নেই, কি করব। এখনই তো আসল সময় বৃদ্ধ বাবা-মাকে সব রকম সাহায্য করার। ছেলের কর্তব্য গুলো কী কী, তা তো ওকে বোঝাতে হবে, বলতে হবে। এরপর ছেলে-মেয়ে হলে ওই তাদের প্রতি যেমন কর্তব্য করতে হবে তেমনি বাবা ও মায়ের প্রতি একই রকম যত্ন নিতে হবে। অনেক দিন ধরে বাড়িতে থাকে না তো তাই বাড়ির প্রতি টান দিনে দিনে কমে যাচ্ছে’। এই বয়সে এসে তাপসী অনুভব করে যে ছেলে মেয়েকে অতি সাধারণ ভাবে মানুষ করা উচিত। ঐ ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে পড়ানো আর নামিদামি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো বা ডাক্তারি পড়ানো এগুলো সব ফালতু। শুধুমাত্র কারিকারি টাকা খরচ ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের জীবনের সবকিছু সঞ্চয় আর এনার্জি জলাঞ্জলি দিয়ে ছেলেকে মানুষ করার পর কি লাভ হয় বাবামায়ের। ছেলে বিশাল এক কোম্পানির অনেক উঁচু পোস্টে চাকরি পেয়ে বিদেশে পাড়ি দেয়। তখন কে বাবা আর কে বা মা! দুনিয়ার নিয়মটাই এই রকমই। তাপসী ভাবে পাশের বাড়ির দীপা কত সুখী। ছেলে হাইস্কুলে চাকরি করে আর বৌমাও তো হাইস্কুলে চাকরি করে। সব সময় ছেলেকে কাছে পায়। অতনুটাও যদি এমনটি হতো তাহলে কি মজাটাই না হতো। কিন্তু কি আর করা যাবে। এ ভাবেই দিন কেটে যাবে। ছেলে মেয়েকে ভালো ভাবে মানুষ করাও তো বাবা-মায়ের কর্তব্য। ওদের সুখেই তো বাবা-মায়ের সুখ। নিজের দুঃখকষ্ট সহ্য করা যায়, কিন্তু সন্তানের দুঃখ সহ্য করা খুবই কঠিন। তাপসী মনে মনে বলে- ‘এবার বাবুকে বলবো আমাদের কে তোর ওখানে নিয়ে যাবি! আর কত একা থাকবো রে। না, থাক, এগুলো বলতে কেমন লজ্জা লজ্জা লাগছে। আমারা তো ভালোই আছি। আর আমি তো একা ওর বাবাকে ছেড়ে যেতে পারবো না। যদি আমাদের দুজনকে জোর করে নিয়ে যেতে চায় তাহলে ওর বাবাকে রাজি করাবোই’।

অবশেষে একদিন ভোর হতেই ঘরের কলিং বেল বেজে উঠল। ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে কোমড়ে জোর চোট লাগলো তাপসীর।ব্যাথাও মলিন হয়ে গেল ‘মা’ ডাক শুনে। ‘কতদিন পর তুই আমায় মা বলে ডাকলি রে বাবু’, বলে তাপসী জড়িয়ে ধরতে যায় ছেলেকে’। ছেলে লাফ দিয়ে তিন

হাত দূরে সরে যায়। বলে , 'মা ! তুমি কী করছো, কী করছো ! আমরা বাইরে থেকে এলাম না। দাঁড়াও আগে ফ্রেশ হয়ে আসি'। বলে, ইংরেজিতে বৌকে কি বলল। তাপসী বুঝতে পারল না শুধু দেখল বৌমা একটুখানি ঠোঁট ফাঁক করে হেসে ছেলের পেছন পেছন চলে গেল। তাপসী আর সুদীপ্তবাবু মিলে ওদের ব্যাগপত্র দক্ষিণের ঘরে রেখে এল। এই ঘরখানা বাবুর বড় প্রিয় ছিল। আজও হয়তো আছে। কিন্তু এ ঘরে এ.সি. নেই। এই শ্রাবণ ভাদ্রের গরমে কেমন করে ওরা থাকবে। এই কথা ভেবে ঠিক করল কয়েকদিন নিজেরা এ ঘরে থাকবে আর ওদের ঘরে এ.সি তে ওরা থাকুক। সকালের জলখাবার বানানোর জন্য তাপসী রান্না ঘরে যায়। ছোটো আলুর দম আর লুচি ভেজে নিতে নিতে বাবুকে ডাকতে থাকে তামসী। ঘরের ভেতর থেকে সারা দেয় বাবু ; বলে, 'আসছি'। দুজনেই সুন্দর ফ্রেশ হয়ে আসে। ওদের দুটিকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় তাপসীর। সেই ছোট্ট বাবুটা কত বড়ো হয়ে গেল। ও এখন বিদেশের বড় এক কোম্পানির ম্যানেজার। ভাবতে অবাক লাগে তাপসীর। কি করে সামলাতে পারে এত কিছু! 'মা। খেতে দাও। কতদিন পর তোমার হাতে খাব গো। দাও! দাও!'

'বোস, বোস। এখনি দিচ্ছি। এই দ্যাখ তোর জন্য কীরকম ফুলকো 'লুচি ভেজেছি'।

খেতে বসে যায় অতনু। মা বলে , 'কি রে একা বসলি যে। বৌমা এল না! খাবে না'।

'খাবে, খাবে। আসছে। আরো দুখানা লুচি দাও তো মা। এসব যে কত দিন ধরে খাই না'!

'খা বাবা খা। অনেক বানিয়েছি'।

তাপসী বারবার ঘরের দিকে দেখতে থাকে, আর মনে মনে ভাবে, কী করছে এতক্ষণ ধরে ঘরের ভেতর। এক ঘন্টা হয়ে গেল। বাপ ছেলের খাওয়া হয়ে গেছে। বৌমাকে দিয়ে নিজে খাবে। অবশেষে বৌমা এল। বৌমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল তাপসী। এ তো স্বয়ং মা লক্ষ্মী। লাল পাড় সাদা শাড়িতে দারুণ মানিয়েছে। বৌমা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে,

'মা খেতে দাও'। এও সুন্দর বাংলা শুনে অবাক হয়ে গেল তাপসী। বাবু বউকে কি সুন্দর বাংলা শিখিয়েছে।

এরপর কয়েকটা দিন ধরে বাড়িতে আনন্দের হাট বসল। আত্মীয়স্বজন এল, এল বন্ধু-বান্ধব। চলল মজা আর হই হুল্লোড়। যাওয়ার দিন এগিয়ে এল। মায়ের মন ভালো নেই। ছেলেকে কাছে পেয়েছেন তো, কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। ছেলেও বুঝতে পারে সবই। নিজেকে স্বার্থপর মনে হয়। কিন্তু যেতে হবেই। বউ এলিয়ার বেশ কষ্ট হয়েছে এ ক'দিন গরমের জন্য। শীতের দেশের মেয়ে তো, তাই গরম সহ্য করতে পারে না। মা-বাবাকে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো। এলিয়াও বলেছিল ওদেরকে নিয়ে যেতে। কিন্তু ওখানে গিয়ে ওরা থাকতে পারবে না। অচেনা অজানা জায়গা কেমন করে থাকবে ওখানে। ওদের সময় কাটানো মুশকিল হবে। ছেলের ভাবনা এরকম। তাছাড়া যাওয়ার পরেই যদি বাড়ি আসার বায়না ধরে তাহলে কি হবে! এবারটা থাক পরের বার ভাবা যাবে। কিন্তু মায়ের খুব ইচ্ছে ছেলের কাছে গিয়ে থাকার। বিদেশে কে না যেতে চায়। তাও আবার নিজেরই পেটের সন্তানের কাছে। কিন্তু সুদীপ্তকে রেখে গেলে তো হবে না। ও কি একা থাকতে পারবে এত দিন। পারবে না কিছুতেই। আবার দুজনেই গেলে বাড়ি ঘর আর ঠিক থাকবে না। এক, হয় ভালো দেখে এক ঘর ভাড়া বসানো। তারপর যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কালই বাবুরা চলে যাচ্ছে। এখন কোথায় ভাড়া পাওয়া যাবে! অসম্ভব ব্যাপার। কাল সকাল সাড়ে এগারোটায় বাবুর ফ্লাইট। সকাল আটটায় বেরিয়ে যেতে হবে। অনেকটা পথ যেতে হবে। এই ভাবনার মধ্যেই বাবু এসে মায়ের কোলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে বলে, 'মা যাবে আমার ওখানে?'

'হ্যাঁ রে বাবু, খুব ইচ্ছে করছে যেতে। কিন্তু যেতে পারবো না রে তোর বাবাকে রেখে। শোন্, তোর বাবা কে বলি যদি রাজি হয়। তাহলে তো আমরা তোর কাছে যেতেই পারি। বলবো?'

ছেলে মায়ের কোল থেকে উঠে বসে বলল, 'না গো মা ! এবার হবে না। আবার যখন আসব! মানে পরের বার তোমাদের নিয়ে যাব'।

'তাহলে বললি কেন রে'!

'এমনি'।
'পরীক্ষা করে দেখিল না রে'!
'না! না ! না গো মা। তা নয়। আসলে আমাদের থাকার সমস্যা আছে তো তাই। বাড়িটা খুব ছোটো তো তাই'।
'জানি বাবা তুমি আমাকে মিথ্যে বলবে না। যাও সোনা ঘুমিয়ে পড়ো। কাল সকাল সকাল বের হতে হবে তোমাদের।
'হ্যাঁ গো মা। মা তুমিও তবে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি আসি। কাল দেখা হবে'। বলে ছেলে চলে যায়।
রাতের যত গভীর হতে থাকে এক নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ শূন্যতা কী এক অস্বস্তিতে তাপসীকে জাগিয়ে রাখে।

তুলা দন্ডের পাল্লা

মালা মুখোপাধ্যায়

- এ কী হলো? এমন তো কোনোদিন হয়নি। আজ কেন হলো এমন। নিজের হাতে গড়া মূর্তি ভেঙে গেল! এ কী ! আর গর্জন ভেসে আসছে। হে প্রভু ! হে দয়াময় ! আজ দশমীতে ঢাকের আওয়াজ পেলাম। তারপর কী গোঁ গোঁ শব্দ! কী আর্তনাদ দিকে দিকে। নদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসে কী ভয়ঙ্কর বুকফাটা কান্না! আমার বুকের ভিতরটা এমন ছটফট করছে কেন?
একটি বড় কুটির থেকে নেমে আসেন যোগমায়া।
তার আশঙ্কা একদম ঠিক। একজন মানুষ পাথরে আটকে আছেন। মরে গেছে কিনা কাছে না গেলে বোঝা যাবে না।
অতি সাবধানে পাথরে পা দিয়ে ধীরে ধীরে জলের কাছে আসেন যোগমায়া দেবী।

হায় অদৃষ্ট ! যোগমায়া এ কাকে দেখছেন ! এ যে তার বিশ্বনাথ। এখানে কেন? মরে গেল বিশু? না তো, নাকের কাছে হালকা গরম হাওয়া ঠেকল। এখনও বেঁচে আছে তো! এখনও প্রাণ আছে ! যোগমায়ার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। হালকা হালকা জল চোখকে ঝাপসা করে তোলে।

বহু কষ্ট করে যোগমায়া তার কাঠের তৈরি ছোট কুটিরে নিয়ে আসেন মুমূর্ষু ব্যাক্তিকে। হিমালয়ের কোলে পাহাড়ী এলাকায় সরু নদীর ধারে নিরালায় তার কুটির। সাধনার পক্ষে যোগমায়ার খুব সুবিধা মনে হয়েছে। তাছাড়া পাহাড়ের কোলে শান্তিতে আশ্রয় চিরকাল যোগমায়া চেয়ে এসেছেন। তাই হয়েছে। কিন্তু এখানে বিশু কীভাবে এলো ? এ কোন খেলা হে মা জগজ্জননী?

দিনরাত এক করে তাকে সুস্থ করে তোলেন যোগমায়া।
ওদিকে বিশ্বনাথের ধীরে ধীরে যত জ্ঞান ফিরছে, তত যেন এই স্পর্শের জন্য ব্যাকুলতা বাড়ছে। খুব চেনা। খুব আপনজন। এই দূরে এখানে কী করে সম্ভব ?
যাকে মনের মধ্যে এতগুলো বছর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাকে কীভাবে পেলেন? এও কি সম্ভব? হা ঈশ্বর! তুমি কি আমার অন্তরের কথা সব শুনেছো ? আমার মনের আকুলতা তুমিই কি টের পেয়েছো? এ তো যোগমায়া! সেই চোখ, সেই মুখের গঠন, আর দৃপ্ত চোখের চাহনি, মুখের কঠিনতা আরও বেড়েছে। কী অপূর্ব রূপ ! তুমি যোগমায়া। তুমিই আমার যগু। তুমিই আমার মায়া। কোনো ভুল নেই আমার। বহু যুগ আগে তোমাকে হারিয়েছি। হারিয়েছি কি? না তুমি স্বেচ্ছায় চলে গেছো? এত অভিমান তোমার? তুমি আমাকে ভালোবাসতে খুব জানি। আমিও কি তোমাকে ভালোবাসিনি বলো? তুমি আমাকে ভুল বুঝে চলে গেলে। না না, ভবানীর সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক ছিল না। তুমি বুঝলে না। তুমি ভবানীর মুখের কথায় বিশ্বাস করলে। ভবানী আমাকে ভালোবাসে। আমি তোমাকে

ভালবাসি। তুমি কিছুই শুনলে না। ভবানীর জন্মদিনে ভবানী বলেছিল ওকে প্রথম আমি কেক কেটে মুখে দেবো, ছোট্ট আবদার ছিল। ওটার ছবি তো উঠবেই। পাশে তো অনেকেই ছিল। এমনভাবে তুমি হারিয়ে গেলে, আর এলে না।

আর একরকম বাধ্য হয়েই বলতে পারো, বাড়ির সবার মতে ভবানী আমার স্ত্রী। আমার কন্যার মা। কিন্তু এই ত্রিশ বছর ধরে আমি তোমাকেই স্বপ্নে দেখছি। তোমাকেই খুঁজে চলেছি। এ যে কী অসম্ভব স্মৃতি যন্ত্রণা নিয়ে বেড়াচ্ছি তুমি বুঝলে না।

তুমি বলো, তুমিই আমার যণ্ড।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভোরের দিকে অস্ফুট স্বরে বলে ফেলেছেন- 'তুমিই মায়া। তুমিই মায়া !'

ওদিকে সামনে মাকালীর কাছে সকালবেলায় স্নান সেরে জপ করতে করতে যোগমায়া সেই ত্রিশ বছর আগের নাম শুনতে পেয়ে চমকে ওঠেন। তাহলে স্মৃতি ফিরে আসছে বিশুর। কিন্তু কখনও বিশুকে বলা যাবে না আমিই সেই। আমি এখন প্রৌঢ়া এক মাতাজি। আমার নাম মহাতপা। আমি মহাতপা; বিশ্বনাথ, আমি তোমাকে কিছুতেই জানতে দেবো না। তোমাকে তোমার ভবানীর কাছে ফিরিয়ে দেবো সুস্থ করে। তোমার মেয়ে আছে। তোমার বউ মেয়ে নিয়ে তুমি সুখেই আছো। আমি তোমার কাছে আজ মিথ্যে এক মায়া। আমি আড়ালেই থাকব। মহামায়ার কি ইচ্ছে জানি না। তবে এই শেষবয়সে আমারও কি তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিল? আমিও কি সব সময় তোমাকেই মনের মধ্যে বহন করে চলেছি? যদি তাই হয়, দেখা তো হলো। তোমাকে ভালো তো করলাম। এই বার আমি আড়ালেই চলে যাব।
আমি পারব না বিশু তোমার কাছে আসতে।

-একটু জল দাও মায়া।
-হাঁ করুন। কেমন বোধ করছেন? কিছু মনে পড়ছে ?
-মায়া! মায়া !
কাঁপা কাঁপা হাত যোগমায়ার হাতের গ্লাসের উপর রাখেন বিশ্বনাথ। এই হাত আমার যগুর।
-আপনি এখন অসুস্থ। আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। আমি মাতাজি মহাতপা। খুব শান্ত ও দৃঢ় শব্দে কেটে কেটে বলেন যোগমায়া।
-আমার ভুল হতে পারে না। আমি তোমার বিশু। সেই অচিনপুরের বিশুকে তোমার মনে পড়ে না? সেই কলেজের ইউনিয়নের ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ।
-আমি তো আপনাকে চিনি না। নদীতে হড়কা বানে ভেসে এসেছেন। তারমানে আপনার বাড়ি অচিনপুর। আপনি কলেজে ছাত্রনেতা ছিলেন। বাহ্। সব মহামায়ার কৃপা। আপনি অনেক সুস্থ হচ্ছেন। আপনার ব্রেনে কোনো ক্ষতি হয়নি। আপনি রেস্ট নিন।
- আমাকে না চেনার ভান করো না মায়া। তুমি যার কারণে ঘর ছাড়লে সে এখন আমার বউ। ভবানী আমার চাকরিকে ভালোবেসে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। ও আমাকে খুব ভালোবাসে আমি জানতাম। কিন্তু বিয়ের পর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওর চাহিদা জাগতিক।
আমি তো ওকে কোনোদিন ভালোবাসিনি। তুমি হারিয়ে গেলে। তারপর পাঁচ বছর তোমাকে খুঁজেছি, তোমাকে পাইনি। মা বাবা অসুস্থ। ভবানীর ইচ্ছা পূরণ হলো। আমার দোষটা কোথায়?
-আপনি উত্তেজিত হবেন না। তার মানে আপনার বউ-এর নাম ভবানী। বাহ্, খুব ভালো নাম।

বিশ্বনাথ কথা বলতে বলতে ক্লান্ত। চুপ হয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকেন।

যোগমায়া নিজের হাতে বিশ্বনাথের খাবার বানাতে থাকে। খাবার বানাতে বানাতে ভাবে- আমি সব জানি বিশু, ভবানী তোমার বউ।

আমি তো ছদ্মবেশে তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার বউ-এর হাত থেকে ভিক্ষা নিয়েছি। তোমার সুখের সংসার দেখে এসেছি। শুধু একবার গিয়েছিলাম। আর যাইনি।
তোমার কোলে তোমার মেয়েকে দিয়ে ভবানী আমাকে এক ঠেকি চাল দিয়েছে। সেই চাল আজও রাখা আছে। তোমার জমির চাল আমি ফুটিয়ে খেতে পারিনি।

হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। যোগমায়ার খুব মনে পড়ে যায় কলেজের সেই সব দিনের কথা-
- বড্ডো বাড়াবাড়ি করছো মায়া। যা মুখে নয় তাই বলছো। ভবানীর বাড়ি গেছি তো কী হয়েছে?
- আমি বারণ করেছিলাম।
-অযৌক্তিক কথা আমি শুনবো কেন? আমার নিজস্বতা বলে কিছুই থাকবে না? সব তোমার কথা মেনে চলতে হবে ? আমি ছাত্রনেতা। আমাকে সবাই দাদা বলে। মেয়েরাও তো দাদা ভাবতেই পারে।
-ভবানী দাদা ভাবে না। নিজের স্বার্থে ডেকেছে তোমাকে। নিজের জন্মদিনে তোমাকে ডাকলে ওর জন্মদিনের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। তুমি ছাত্রনেতা। তোমার হাত থেকে কেক খাচ্ছে। এই ছবি সবাইকেই কলেজের দেখাচ্ছিল।
- এতো নিচে নামবে না। ওর চোখে সম্মান আছে।
- আর তোমার চোখে লোভ আছে। তোমার জনপ্রিয়তা বাড়বে।
- তুমি অন্ধ হয়ে গেছো। এটাও এক ধরনের রোগ। আমাকে ভালোবাসো, আমার প্রতি তোমার অধিকার বোধ।
- না, মোটেও না। তোমার বাস্তব জ্ঞান কম। তোমাকে ওরা ওদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।
- কি এমন স্বার্থ? আমার কাছে তো কোনো কিছু চায় না। শুধু আবদার করেছিল, ওর জন্মদিনে যাওয়ার জন্য।

- এইটুকু মানতে হবে। আমি তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি না। আমি আলাদা মানুষ।
- কেউ কারোর সম্পত্তি নয়, আমি জানি। কিন্তু তোমার ভুলটা আমি ছাড়া কে ধরাবে?
- আমি বাচ্চা ছেলে নই।
- হতে পারো লেখাপড়ায় ভালো। হতে পারো অপরাজেয় নেতা। কিন্তু ভবানীর চালে তুমি হেরে গেছো। কলেজের ছাত্রনেতা তুমি। তোমাকে মানায়নি।
- সব ভুল। সব ভুল মায়া তোমার। আমি তোমাকেই ভালোবাসি।
- তাহলে ভবানীর বাড়িতে যেতে না।
- তুমি কলেজে পড়া মেয়ে, ছিঁচকাঁদুনে কিশোরীর মতো আচরণ তোমাকে মানায় না।

ভাতের তলা ধরে গেছে। পোড়া পোড়া গন্ধ চারদিকে। যোগমায়া চোখ মুছে সঙ্গে সঙ্গে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রাখে।
ওদিকে ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বিশ্বনাথ। জড়ানো গলায় বলে, যোগমায়া ভাতের তলা পুড়ে গেল যেএএএ।
- আপনি বিশ্রাম নিন। উপরের ভাত আপনাকে দেবো।
- তুমি পোড়া ভাত খাবে মায়া-য়া-য়া।
- আমি মহাতপা।
-না, তুমি যোগমায়া। তোমার সুরেলা কণ্ঠ, আমার মনে আছে, এই সেই গলা। সেই আম গাছটার কথা মনে আছে? তোমার আর আমাদের গাঁয়ের মাঝে একটি খুব বড় আম গাছ ছিল।
- না, না, আমার কিছুই মনে নেই। আমি যোগমায়া নই। আমি মহাতপা।
- তুমি আমাকে বকবে না মায়া। তুমি বকলে আমার বুকের ভিতরে খুব কষ্ট হয়। তুমি শুধু আমাকে ভালোবাসবে। মিষ্টি মধুর কথা বলবে।
কলাপাতায় ভাত দিতে দিতে ভাবে, আমি বকলে তোমার কষ্ট হচ্ছে বিশু, আর তুমি যে ভবানীকে কেক খাওয়ালে তখন আমার মনে কষ্ট হয়নি?

আমি মানুষ না? আমার মন নেই বিশু ? আমি তো তোমার সঙ্গে সব বিবাদ মিটিয়ে নিয়ে হারিয়ে গেছি। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে থাকলে আমার যে মন ভালো থাকে না। আমিও যে খুব কষ্ট পাই বিশু। কিন্তু সে কথা তোমাকে কোনোদিন জানাবো না। এবার একদিন থানায় গিয়ে তোমার বাড়িতে খবর দিতে বলবো। তোমাকে নিয়ে যাবে।

কোনোরকমে কষ্ট করে উঠে বিশ্বনাথ ভাত খেতে বসেন। কাছেই বসে আছেন যোগমায়া। বিশ্বনাথের নাকে এসে লাগে সেই গন্ধটা, খুব চেনা গন্ধ। যোগমায়ার শরীরের গন্ধ। সেই বিদায়বেলার গন্ধ। যদিও আমি বুঝতে পারিনি সেটাই শেষ দেখা ছিল কিনা। এখন বুঝি, দুই দিনের ঝগড়ার পর তোমার আমাকে ডেকে ভাব করাটা ছিল তোমার অভিনয়। আমি কাছে ডাকলে তুমি খুব নিবিড় ভাবে আমার কাছে এলে। তোমার ঠোঁটের কাছে আমার ঠোঁট গেলে মাঝে তুমি একটা আঙুল তুলে বললে, ওটা পরে হবে। তার পরদিন থেকে তুমি নিখোঁজ। সেই গন্ধ আমি এখন পাচ্ছি মায়া। তুমিই মায়া !

আরও পাঁচ-ছয়দিন পর যোগমায়ার চেষ্টায় বিশ্বনাথকে নিতে আসে ভবানী। বিশ্বনাথের ঘুম ভাঙে ভবানীর স্পর্শে। কিন্তু বিশ্বনাথ অবাক হয়ে ঘরের চারদিকে তাকাতে থাকেন। যোগমায়া বলে চিৎকার করে ডাকতে গিয়ে থেমে যান, সামনে দাঁড়িয়ে ভবানী। চারদিকে থমথমে ভাব বুঝিয়ে দেয় যোগমায়া নেই।
বিশ্বনাথ উঠে পড়ে কুটিরের পিছনের দিকে খুঁজতে থাকে।
না, কোথাও নেই যোগমায়া।
শুধু একটি বড় গাছের আড়ালে একটি মূর্তি দেখতে পান, ভাঙা মূর্তি। কোনোরকমে জোড়া লাগানো হয়েছে। মূর্তির খুব কাছে গিয়ে দেখেন ওর নিজের কলেজ জীবনের মূর্তি। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা বিশ্বনাথের মূর্তি।
যোগমায়ার মুখে প্রশান্তির ছাপ বিশ্বনাথ দেখেছেন।
আর বিশ্বনাথের মুখে অস্থিরতার ছাপ দেখেছেন যোগমায়া।

সাফল্য অভিযানের বলি

সুমিতা চৌধুরী

আবীরের নিথর দেহটা শোয়ানো আছে বিছানায়। নাইলন দড়ির ফাঁসে ঝুলেছিল। গলায় কালসিটের মতো দাগ। ঝুলে থেকে প্রাণটা বেরিয়ে যেতে কতোই না কষ্ট হয়েছে। তবুও, মুখে তার লেশমাত্র নেই। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, প্রশান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে অনেকদিন পর। হয়তো তাই, অন্তত তার শেষ লেখা নোট বা সুইসাইড নোট তাই বলছে। লেখা আছে, " আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি হেরে গেলাম জীবনযুদ্ধে। অনেক অনেক দিন ঘুম হয় না। এবার শান্তিতে ঘুমাবো।" ছোট্ট ছোট্ট কথার কি বিশাল গভীরতা।

ছেলেটা শান্ত স্বভাবের হলেও বেশ মিশুকে বলেই পরিচিত ছিল। তবে, ইদানিং প্রায় একাই থাকতো, বাড়ি থেকেও খুব একটা বেরুতো না, কারো সাথেও তেমন কথা বলতো না। সবাই জানতো সফল ক্যারিয়ার গড়ার নেপথ্যের প্রয়াস। শুধু মাঝে মাঝে রাতের বুক চিরে শোনা যেত গিটারের করুণ সুরের আলাপ। গুণী ছেলে, কবিতা-টবিতাও নাকি লেখে, বন্ধুমহলে তাই শোনা যায় এবং কয়েকটা ছোটোখাটো ম্যাগাজিনেও প্রকাশ পায়। গানও গাইত পাড়ার ফাংশনে আগে, সবার অনুরোধে। তবে, এখন এসব অতীত। বাবা মায়ের কথামতো, তাদের স্বপ্নপূরণের চাহিদায়, ডাক্তার হওয়ার সফল ক্যারিয়ারেই ব্যস্ত ছিল। বুঝি দম ফেলার ফুরসত ছিল না। তাই বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, সবই বন্ধ ছিল। বর্তমান লাইফস্টাইলে গড়াই ছিল তাদের বাবা, মা ও ছেলের ছোট্ট সংসার। বাবা-মা দুজনেই কর্মরত ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল, প্রতিষ্ঠিত। বাবা ডাক্তার, মা প্রফেসর, কারোরই তেমন ফুরসত নেই কাজের জগতের বাইরে। ছেলে ছোটো থাকতে কখনো দিদা, কখনো ঠাকুমা আসতেন, যেতেন, থাকতেন, দেখতেন। অবশ্য সারাক্ষণ আবীরের দেখাশোনার জন্য পরিচারিকা, আয়া ছিলেন। উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পর যথেষ্ট বড় ও স্বাবলম্বী হওয়ায় সেই

পাঠ চুকেছে। দিদা, ঠাকুমারও বয়স আরো বেড়েছে, বেড়েছে অক্ষমতাও। এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ আবীর সম্পূর্ণ একাই থাকতো। ঠিকে কাজের লোক তার নির্দিষ্ট সময় মতো এসে বাড়ির কাজ সেরে দিয়ে যেত। বন্ধুবান্ধব আসতো প্রায়ই, আড্ডাও জমতো। তবে মা বাবার নির্দেশে সফল ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যে মনোনিবেশ করায়, নির্জন বাসই ছিল ইদানিং আবীরের অভ্যাস। ছেলেটার একটা স্বভাবের কথা সবাই জানতো, মা-বাবা কেনো, কাউকেই সে কোনো বিষয়ে 'না' বলতে পারতো না। তাকে কেউ কিছু বললে, হাজার অসুবিধে বা অনিচ্ছা স্বত্তেও সেটাই মেনে নিত এবং আপ্রাণ চেষ্টা করতো কথা রাখার। হয়তো তেমনই ছিল এই ডাক্তার হওয়ার ক্যারিয়ারে মনোনিবেশও। যার চেষ্টায় নিজের সব ইচ্ছের জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজের সবটুকু নিংড়ে দিতে দিতে হয়তো নিজেই শেষ হয়ে গেল। না, পড়াশোনায় মোটেই খারাপ ছিল না আবীর কোনোদিন। তবে তো ডাক্তারি পড়ার সুযোগটুকুও জুটতো না। আর অন্যের দয়াদাক্ষিণ্যকে সে বরাবরই ঘৃণা করে এসেছে। সে নিজের বাবা হলেও। তাই, বাবার সুপারিশে নয়, নিজের যোগ্যতাতেই পড়ছিল। কিন্তু তার মনের কোণে অন্য স্বপ্ন যত্নে লালিত হচ্ছিল, বাড়ছিল। সেই স্বপ্নটাকে নিজের হাতে গলা টিপে মারতে গিয়ে হয়তো হাতটা আরো খানিক লম্বা হয়ে নিজের গলাতেই ফাঁস হয়ে বসল। অন্তত ডায়রি তাই বলছে। ডায়রির শেষ পাতায় লেখা আছে," কবিতা তোকে বড় ভালবেসেছিলাম। কিন্তু ক্যারিয়ার হিসেবে তুই যে বড়ই দুর্বল, রুগ্ন, সফলতার দৌড়ে বড্ড বেমানান, সমাজের মাপে খাটো। অর্থবান নোস তুই, তাই। কিন্তু তোকে নিয়েই গান বাঁধতে চায় আমার গিটার, আমার সব স্বপ্নরা তোকে ঘিরেই। কিন্তু গিটারকেও আজ সময় দেওয়া বারণ, তোরই মতো। বিজ্ঞানকে আমার ভালোলাগে, ভালোলাগে আবিষ্কার, খুব ভালো লাগে মানুষের সেবাও। কিন্তু তোকে অনেক অনেক বেশী ভালো লাগে, আমার মনের কাছের মনে হয়। কিন্তু, সেই ভালোলাগাটা নাকি সময়ের অপচয়। হবে বা! মেনে নিতে হলো, মেনে নিলাম। আর মেনে নিলাম বলেই বোধহয় তুইও অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিস আমার থেকে। তাই তো কলম থেকে আজ আর শব্দ বেরোয় না

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। আমি খুব চেষ্টা করছি মা, বাবার কথা রাখার। কিন্তু পারছি না। পড়ার বইয়ের অক্ষরগুলো কান পর্যন্ত গিয়েও মর্মে প্রবেশ করছে না। মরমে যে তুই আছিস, সবটা জুড়ে। গিটারটাও আজ আর আনন্দের সুর ধরে না, কেবলই কান্নার সুরে অবিরাম মনের কথা বলে। বড় দমবন্ধ আমার চারপাশ। জানি না, কীভাবে মুক্তি পাবো। আদৌ পাবো কিনা?"

পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করতে প্রথমেই ঐ সুইসাইড নোট পায়। আর তারপরই আরো কিছুর সন্ধানে আবীরের বইয়ের তাক ঘেঁটে দেখতেই ডাইরিটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার শেষ পাতার এই লেখাটি পড়ে কেন জানি ইনভেস্টিগেশন অফিসার সেই পাতাটি খোলা অবস্থায় ডায়রিটা এগিয়ে দিলেন আবীরের মা, বাবার হাতে। কাঁপা হাতে পড়তে পড়তে অক্ষরগুলো ঝাপসা থেকে আরো ঝাপসা হতে থাকে। হয়তো খানিক স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন দুজনেই পুলিশের সামনেই। হয়তো এই কান্না ছিল আফসোসের, হয়তো সফলতার নেশায় অন্ধত্বের, হয়তো বা যন্ত্রমানব গড়ার নিদারুণ যন্ত্রণার। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে সবটুকু উপলব্ধির।

পটীয়সীর পরকীয়া

প্রদীপ দে

বেঁটে বকাই দৌড়ে এল। তখন আমরা বেশ কয়েকজন রামুর চায়ের দোকানে নড়বড়ে টেবিলটায় বসে এক হাতে চায়ের গ্লাস ধরেছি আর অন্য হাতে সিগারেট; চায়ে চুমুক দিয়েই সিগারেটের ধোঁয়া গেলার অপেক্ষায় ইন্তেজার করছি; এমন সময়েই বেটে বকাইয়ের আগমন এক ভয়ংকর খবর

নিয়ে; আমরা বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমরা মানে তখন ওখানে গুলতানি মারছিলাম- লম্বু গণেশ, ট্যারা টুটুল,তোঁতলা পুকাই, পুঁচকে সাহস, হাবলা হরি আর আমি। আমার পরিচয় আমি ব্যাকা বালু। আসলে এই পরিচিতি গুলো আমাদের গুলতানি সঙ্ঘের সদস্যদের দেওয়া নাম।

বেঁটে বকাই হাফাচ্ছে রীতিমতো।

-আরে বলবি তো কি হয়েছে?

-দাঁড়া দাঁড়া, ছুটে এসেছি, আগে এক গ্লাস জল পেটে ঢালি, তারপর সব বলছি।
পুরো এক গ্লাস জল গিলে নিল। তারপর বললো, 'পটলার বউ পটলাকে পেটাচ্ছে। প্রেম করে বিয়ে করা বউ কী মার মারছে রে। মরে না যায়!'

আমরা তারস্বরে চিৎকার করে উঠলাম, 'সে কী রে? এও সম্ভব? কী দিনকাল এলো রে? আগে তো আমরাই বউগুলোকে আচ্ছা কেলান কেলাতাম, আর এখন কি হলো রে? বউরাই মারছে?'

সবাই দৌড়ে গেলাম পটলার বাড়ি। বিপদে বন্ধুর পাশে থাকতে হয়। এটাই নিয়ম। না হলে কীসের বন্ধু? বাড়িতে পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়তে যাবো দেখি দরজা হাট করে খোলা, আর সামনে হাফপ্যান্ট পরে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মূর্তিমান পটলা পটল। আমাদের দেখেই তার কী কান্না - হাউমাউ করে
-এসেছিস? বাঁচা তোরা!

কী করে বাঁচাই, আর কীইবা হয়েছে? এদিক ওদিক উঁকিঝুকি মারছি যদি ওর বউ পটীর দেখা পাই।

-এই যে সব নেশাখোরেরা, এসে গেছেন দেখছি-
বলেই সুন্দরী বউ পটীয়সী ছুটে এলেন। আমরা কে কার আড়ালে যাবো তাই ভাবছি। সে সুযোগ পেলাম না। পটী কোমড়ে কাপড় গুঁজে তেড়ে এলো। পালাবো কি না ভাবছি, কিন্তু পালাবার পথ নেই; যম আছে পিছে; ঘুরে দেখি ওর মা পিছনে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে।
ওর বউয়ের অর্ডার, 'সব ভিতরে আসুন, কথা আছে'।

ভয়ে গুটিশুটি মেরে ঘরে গেলাম। ঘর লন্ডভন্ড। একটু আগে এখানে একটা ঝড় বয়ে গেছে, দেখলেই বোঝা যায়। আমারা এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে গেলাম।

বউ পটীয়সী ব্যঙ্গ করে বললে, 'আপনাদের বন্ধু আবার নতুন করে প্রেম-প্রেম খেলা শুরু করেছে? বুঝলেন? বুঝলেন কিছু?'

লম্বু গণেশ তুলনায় সাহসী; সেই উত্তর দিল, 'সে কী? এ কেমন কথা? ঘরে এত সুন্দর বউ থাকতে এমনটা কেউ করে?'

বউদির মুখ লাল হয়ে গেল। মানে কাজ হলো।
-বসুন না গনাদা।

আমরা সকলে মিলেই লম্বু গণেশকে নকল করলাম। বৌদি পটীয়সীর খ্যাতি করলাম। তোঁতলা পুকাই আবার এক কদম এগিয়ে পটলকে টেনে আনলো ঘরের ভিতর। তোঁতলানো সুরে বলার চেষ্টা করলো, 'তু-তু-তু -ই এ-এ-এ-মন ক্যা-ক্যা-নো কো-কোরলি?
পুঁচকে সাহস দৌড়ে গেল। পুকাইকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বৌদির কাছে সাহস দেখিয়ে পটলার গালে চড় মারার মত আঙুল নিয়ে গেল আর চিল্লালো, 'দেবো না ঠাঁটিয়ে একটা?'

হাবলা হরিও কম গেল না, 'দে দে ওকে? ও কি বন্ধু হতে পারে?'

পটলার বউ পটীয়সী রে রে করে উঠলো।
-থাক থাক, খুব হয়েছে।

বেঁটে বকাই আর সাহস করে এগোলো না।

বৌদি দেখলাম একমাত্র লম্বু গণেশকেই কেমন যেন পাত্তা দিল। হেসে হেসে বললে, 'চা খাবেন গণেশ বাবু?'

হয়ে গেল আমাদের! আমরা বাকিরা সব হলাম কাবু। গণেশ কায়দা করে পটল কে নিয়ে বেরোতে চাইলো। বৌদিও রাজি হয়ে গেল। আমরা পটলা কে বাইরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার কেমন যেন মনে হলো বৌদির চোখে লম্বুর নেশা!

বাইরে বেরিয়ে সকলে মিলেই পেটুক পটলাকে নিয়ে পড়লাম।
-দ্যাখ কেমন বুদ্ধি খেলালাম। তোকে ভয় দেখিয়ে বৌদিকে বোকা বানালাম। পেটুক হেসে ফেললে, 'তোরা তাই না আমার বন্ধু? এখন খুব খিদে লেগেছে চল কিছু পেটে দিই'।

সব্বাই আমাদের রামহরির চায়ের ঠেকে গিয়ে নাস্তা করলাম। পেটুক পটলা একাই বিল দিয়ে দিল।

এরকম ভাবেই আমরা চলছি। ভাবলাম পটলার পরকীয়ার ঘোর বুঝিবা কেটে গেছে। সপ্তাহ কাটলো না, খবর এসে গেল আবার মারামারির। পটীয়সী পটলাকে মেরে চোখ ফুলিয়ে দিয়েছে। কী করা যায়? চায়ের দোকানের মালিক পথ বাতলে দিলো; ও সব জানতো; আমরা যে সব আলোচনা ওখানেই সারি। রামহরি বললে, 'আপনাগো গিয়া কাম নাই।

এক কাম সারেন, ওই লম্বুটারে ওহানে পাঠায়ে দেন, ওরে খাতির করে পটী।

একদমই ঠিক কথা। ভেবে বলেছেন। আমরা ভাবতেও পারিনি। লম্বু গণেশকেই ধরলাম। ও কিছুতেই যাবে না। অনেক বুঝিয়ে রাজি করালাম।

গণেশ ঘুরে এসে জানালো, 'পটলের স্বভাব খারাপ। কচি মেয়ে দেখলেই পটানোর ধান্ধা করে। এবারে ও নিজে ম্যানেজ করেছে। পটলা নাক-কান খৎ দিয়েছে, বলেছে আর করবে না'।

অবাক কান্ড, আবার পটলা পাড়ার এক মাসিকে নিয়ে লটরপটরে জড়িয়ে পড়লো। কি ঝামেলা?
আবার গণেশকে হাতে-পায়ে ধরে পাঠালাম। বউয়ের হাতে বন্ধু মার খাবে এটা দেখা যায়?
তবে পটলাকে বলে দিলাম, 'এই কিন্তু শেষবার'।

গণেশ পটীয়সী কে বোঝাচ্ছে, 'এইবার ওকে শেষবারের মত ছাড় দিন। ও কথা দিয়েছে, কোনো দিন এরকম করবে না'।

পটীয়সী গণেশকে পছন্দ করায় রাজি হয়ে গেল। তবে একটি শর্তে। আর একবার খবর হলেই আমি সুযোগ পেয়ে যাবো, আর আমিও দেখিয়ে দেবো পরকীয়া কাকে বলে!

পটলা রাজি হয়ে গেল। আর গনশা বেশ ফুরফুরে মেজাজে পাড়ার হিরো হয়ে গেল। দেখলাম মাঞ্জা দেওয়া রঙিন পাঞ্জাবি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মহিলাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গেছে। পটলাকে দেখলেই গালি দিচ্ছে।

বেশিদিন গেল না, পেটুক পটলার খবর হয়ে গেল। পাশের পাড়ার রামকানাইয়ের মেয়ে হাতির হাতে জুতোপেটা খাচ্ছে। স্পাই মারফত বউ পটীয়সীর কাছে খবরও চলে যেতে সময় নিল না। আমরা সবাই ভাবছি, 'কী হয়? -কী হয়?' লম্বু গনশার খবর নেই। যদিও ও আর যাবে না। তবুও সব্বাই ওকে চাইছি। না, সারাদিন কেটে গেল, রাত দশটা বেজে যেতেই আমরা যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়াচ্ছি, এমন সময় পটলা দৌড়ে এলো, 'বিপদ হয়ে গেছে ভাই। আমার বউ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে'।

সবাই তারস্বরে চিৎকার করে উঠলাম।
'সে কী রে? কিন্তু কোথায় গেছে জানিস?'

পেটুক পটলা কাঁদছে, 'না তা জানিনা। তবে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। এখন বালিশের তলা থেকে পেলাম।

'সে কী রে? পড়, আগে পড় শুনি'।
'হ্যাঁ। পড়ছি –লিখেছে, 'বলেছিলাম না পরকীয়া কাকে বলে দেখিয়ে ছাড়বো; এবার দ্যাখো, কেমন লাগে; আমি তোমারই বন্ধু লম্বু গনশাকে নিয়ে ভাগলাম। পারলে কিছু কোরো। আমরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসি; ছেড়ে থাকতে পারছি না; তাই তোমাকেই ছেড়ে চলে গেলাম। খোঁজ করে লাভ নেই, আমরা স্বেচ্ছায় পালালাম। পরে সুবিধা মতো তোমার কাছে উকিলের নোটিশ পাঠাবো আর খোরপোশ সহ সব পাওনাগন্ডা আদায় করে তবে আমি তোমায় ছাড়বো -এই বলে রাখলুম তোমায়।

ইতি ,
তোমার নয়, এখন আমি গনশার পটীয়সী'

রান্নাশালের পেতলের কলসটি

অঞ্জলি দে নন্দী (মম)

মা রান্নাশালায় সারাটি দিন ও সন্ধ্যের পরেও কেরোসিনের লম্ফ জ্বেলে রান্না করত। তার নানান মশলার কৌটোর কাছেই একটি পুরোনো পেতলের কলস ছিল। তার মুখে একটা পেতলের সরা চাপা থাকত। বাবা দোকান থেকে এসে রোজ রাতে মায়ের আঁচলে টাকা ও পয়সা চটের ব্যাগ থেকে ঢেলে দিয়ে আবার সেই ব্যাগটা তার সাইকেলের হ্যান্ডেলে টাঙিয়ে রাখত। বাবাকে মা রোজ সকালে দুধে খই, মুড়ি, মুড়কি, গুড়ের বাতাসা, পাকা কলা মেখে খেতে দিত। আর এক গ্লাস জল। বাবা খেয়ে ব্যাগ নিয়ে সাইকেল চালিয়ে দোকানে যেত। আমাদের হাটে মুদিখানার দোকান ছিলো। বাড়ি থেকে দোকানের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিমি মতো হবে। দুপুরে আবার বাবা খেতে আসত। তারপর আবার বিকালে দোকান যেতো। আর রাতে এসে বাড়িতে ঘুমত। মা ওই কলস থেকে টাকা, পয়সা নিয়ে সংসার খরচ চালাত। দাদুর কাশির ওষুধের দাম দিত। ঠাকুমার পান, সুপারি, খয়ের, চুনের দাম দিত। দাদার টিউশনির টাকা দিত। আমার আইসক্রিম, বাঁশি, বেলুন, লাট্টু, ঘুড়ি, কাঁচের গুলি কেনার টাকা দিত। নিজের জন্য কিছুই কিনত না। ওই কলসটি খুলে টাকা নেবার ইচ্ছা আমাদের সংসারের কারোরই ছিল না। চাইলে যে কেউ নিতে পারত কিন্তু কেউই নিত না। ওটা যেন শুধু মায়ের জন্যই। মা কিন্তু কখনই কোনও নিয়ম করে দেয় নি, তবুও; এমন কি বাবাও তার নাকে নেওয়ার নস্যি কেনার জন্য মার কাছে টাকা চাইত, আর মা তখনও ওই কলসের ঢাকা খুলে বাবাকে টাকা দিত। ওটাই ছিল আমাদের এটিএম।

দাদা বড় হল। গ্রামের স্কুলের পাঠ সম্পূর্ণ হল। শহরের কলেজে পড়তে গেল। হোস্টেলে থাকল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠও সম্পূর্ণ করল। সে এরপর আমেরিকায় গবেষণা করতে গেল। আমাদের বাড়ি মাঝে মধ্যে অসে। তখন দাদার আর মায়ের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার

দরকার হয় না। প্রচুর ডলার তো সে পায়ই। তবুও মা তার হাতে কলস থেকে টাকা বের করে দেয় আর বলে, " তোর ইচ্ছেমত খরচ করিস। " দাদা তা নিয়ে বাজার যায়। বেগুনী, আলুর চপ, জিলিপি, বোঁদে কিনে আনে। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে বসে বিকেলে খাই।

এরপর আমি বড় হলুম। আমিও দাদার ওখানে গেলুম। আমি ও দাদা যখন বাড়ি আসতুম তখন মা আমাকে ও দাদাকে টাকা দিত। আমরা সেই টাকায় টিকিট কেটে আনতাম। পুরো পরিবার একসঙ্গে কোনও তীর্থ স্থানে যেতাম।

বহু বছর কেটে গেল। আমাদের বিয়ে হল। সন্তান হলো। দাদা ও আমি আমাদের পরিবার নিয়ে বাড়ি আসতাম। মা তখন আমাদের সন্তানদের হাতে সেই কলস থেকে টাকা বের করে দিয়ে বলত, " নিজেদের ইচ্ছেমত খরচ কর। " ওরা তাই করত”।

এরপর দাদু, তারপর ঠাকুমা, তারপর বাবা এক এক করে মারা গেছে। আমি ও দাদা সবারই মৃত্যুর সময় সন্তানদের নিয়ে এসেছি। বাবা মারা যাবার পর আমি মাকে আমার কাছে নিয়ে যেতে চাইলাম। দাদা বলল, " মা আমার কাছে থাকবে! " মা বলল, " আমি ছ'মাস বড় ছেলের কাছে ও ছ'মাস ছোট ছেলের কাছে থাকব! " এবার মা সেই কলসটিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। তার ভেতরে তখনও বাবার দেওয়া টাকা-পয়সা রয়েছে।

ফেলে আসা দিন

মিঠুন মুখার্জী

নবমীর দিন রাত দশটা। মোটরসাইকেল নিয়ে সন্দীপ ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে। সঙ্গে জায়া সন্দীপ্তা ও একমাত্র মেয়ে আরাধ্যা। প্রচন্ড ভিড়ের কারণে রাত করে বেরোনো। ভিড় অনেকটাই কম। সুন্দর সুন্দর

মণ্ডপ ও বিগ্রহ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় সকলের। আরাধ্যা ফুচকা খাওয়ার বায়না জুড়ে দেয়। ফুচকা খাওয়াতে গিয়ে সন্দীপের দেখা হয় নবনীতার সঙ্গে। সঙ্গে তার স্বামী ও ননদ। নবনীতা তাকে দেখে অচেনার ভাব করে। মুহূর্তে সন্দীপের মানসপটে ভেসে উঠেছিল অতীতের দিনগুলির স্মৃতি।

নিজের জীবনের থেকেও সন্দীপ বেশি ভালোবেসেছিল নবনীতাকে। বি.এস.সি প্রথমবর্ষ থেকে তারা একসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো। নবনীতাই তাকে প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিল। রাজি না হওয়ায় একপ্রকার ব্ল্যাকমেইল করেই রাজি করিয়েছিল তাকে। পাঁচ বছরের সম্পর্ক একটা ভুল বোঝাবুঝিতে নষ্ট হয়ে যায়। সন্দীপ এম.এস.সি পাশ করার পর তিন বছর সময় চেয়েছিল নবনীতার বাবার কাছে। তিনি তা দেননি। তিনি বলেছিলেন, "তোমার মতো এম.এস.সি পাস ছেলে কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার কিছু হবে না। "বাবার কথার কোন প্রতিবাদ সেদিন নবনীতা করেনি। বাবা বিয়ে ঠিক করলে চুপচাপ মেনে নিয়েছিল সে। বিয়ের কার্ড সন্দীপের হাতে দিয়ে বলেছিল, "আমার কিছু করার নেই। আমি নিরুপায়। তোমার ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে আমি আমার জীবনকে জড়াতে পারলাম না। আমায় পারলে ক্ষমা কোরো। "এই কথা শুনে সন্দীপ রেগে গিয়ে নবনীতার গালে কষে একটা চড় দিয়েছিল। সন্দীপ তাকে বলেছিল, "সব মেয়েরাই এক। প্রেম করে নিজের ইচ্ছায়, বিয়ে করে বাবার কথায়। বিয়ে যদি করতে পারবি না তাহলে আমাদের মতো ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়িস কেন?" দু-চোখে জল দেখা গিয়েছিল সন্দীপের। এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় নবনীতার। একাগ্র চিত্তে পড়াশোনা করে কিছুদিনের মধ্যেই কলেজের প্রফেসর হয় সন্দীপ। তারপর প্রায় পাঁচ বছর নবনীতার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তবে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে সে জেনেছিল, 'বিয়ের কার্ড হাতে দিয়ে নবনীতা তাকে যে কথাগুলো বলেছিল, সেগুলো ওর মনের কথা নয়। বাবা-মার ব্ল্যাকমেইলে পড়ে ওই কথাগুলো নবনীতা বলতে বাধ্য হয়েছিল।' সেই বন্ধুর কাছ থেকে সে এটাও জেনেছিল যে, 'নবনীতার স্বামী প্রতিদিন মদ

খেয়ে নবনীতাকে মারধর করে। আর্থিক সুখ থাকলেও মানসিক সুখ নেই তার। তাছাড়া এখনো পর্যন্ত একটা সন্তানেরও মুখ দেখেনি।'

অতীত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দুচোখ চিকচিক করে উঠে সন্দীপের। আরাধ্যা ও সন্দীপ্তার ফুচকা খাওয়া হলে তারা সেখান থেকে অন্য মন্ডপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

স্নেহনীড়

সানিয়া পারভীন

শ্রাবণ মাসের বিকেল, বাড়ির ঠিক পাশেই একটি বড় কদম গাছ, যেন দম্ভভরে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। এতটাই উচুঁ যে তিন ফুট এর একটি বাচ্চা মেয়ের জন্যে তা স্পর্শ করা বড়ই কঠিন। পাশাপাশি দুপুর থেকেই অবিরাম বৃষ্টি ইতিমধ্যেই শহরের মাটিকে জলসিক্ত ও জবজবে কাদায় পরিণত করেছে। বিশেষ কারণে ঘরের সদস্যরা বাড়ির বাইরে গেছে কিছুক্ষণ। ফলে ছোট্ট শিশু সুমির মনটিও আমোদে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। একাকী সময় কাটানোর অনুভূতিটাই আলাদা; সাথে যদি থাকে বৃষ্টির মনোরম সৌন্দর্য তবে প্রকৃতির এ রহস্যময়তা আরো বেশি করে উপলব্ধি করা যায়। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা যেন ঘাসের মাঝে ঝরে পড়ে অতি সন্তর্পণে ভিজিয়ে দিয়ে যায় সমগ্র প্রকৃতিকে। কদম ফুলগুলি গাছের বুকে যেন নিটোল নির্মল ভাবে ফুটে রয়েছে। তবে মুহূর্তেই একটি দুটি করে ঝরে পড়ছে এবং কাদার সাথে মিশে তার দেহবল্লরী হয়ে উঠছে কর্দমাক্ত। ঝরে পড়া ফুলগুলির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুমি, কেমন অনন্য অনুপম বলে মনে হয় তার। কারো কাছে এই দৃশ্য হতে পারে নিতান্তই এক ঝরে পড়া ফুল, আবেগহীন অনুভূতি। তবে এই ছোট্ট শিশুটির কাছে তা এক বহুমূল্য স্নিগ্ধ আবেগ, মাধুর্যেভরা বিচিত্র রঙিন চিত্রণ। বৃষ্টির দিনে রবিবারে দুপুর থেকেই ঘরের বাইরে কাউকেই দেখা যায়না; সম্ভবত সবাই

ভাত ঘুমে আচ্ছন্ন। অর্থাৎ কারো কাছে ফুল পেড়ে দেওয়ার আবদারও চলে না। তাহলে কীভাবে ফুল সংগ্রহ করা যায়! ভাবে সুমি। এই নাদুস নুদুস শরীর নিয়ে আবার গাছে উঠতে হবে নাকি! নাহ্, তা যে একেবারে অসম্ভব। যদি পাখি হওয়া যেত, ডানা মেলে সহজেই উড়ে গিয়ে বসা যেত গাছের প্রতিটা ডালে। এমন ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ কুড়ি-বাইশ বছরের এক দাদাকে পথ দিয়ে যেতে দেখে সে, ছিপছিপে শরীর এবং গালে কাটার দাগ স্পষ্ট। তার কাছে ফুল পেড়ে দেওয়ার আবদার করলে ছেলেটি একটি শর্ত রাখে, শর্তটি হলো তার কাদায় মাখা জুতো জোড়া ধুয়ে আনতে হবে, মনে মনে রাগ হলেও শর্ত পূরণ করে সুমি। এবং পূরণ করার সাথে সাথেই সে ফুলও পেড়ে দেয়। মুহূর্তেই প্রাণভরা হাসিতে সুমির ছোট্ট হৃদয়টি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই দাদাটির ছোটো বোন এসে উপস্থিত হয় এবং সে জেদ করতে থাকে ফুলগুলি তাকেই দিতে হবে, অগত্যা সে তার বোনকে ফুলগুলি দিয়ে দেয়। এতটা অবিচার করার পরও তারা কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনা, ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। অচিরেই মিলিয়ে যায় ছোট্ট মুখের সে নির্মল হাসি, রাগে অভিমানে চোখদুটি দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারা নামতে থাকে, অস্পষ্ট দিনের আলোয় বৃষ্টির সাথেই মিলিয়ে যায় অশ্রুসিক্ত সেই দুই চোখ। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, আঁধারের আভায় প্রস্ফুটিত কদম ফুলগুলি আরও বেশি উজ্জ্বল বোধ হয়। মাথা উচুঁ করে কদম গাছের সৌন্দর্য পরীক্ষা করতে থাকে সুমি, গাছটির চতুর্দিক ঘিরে আছে যেন এক অদৃশ্য স্নেহনীড়। চোখে পড়ে কৃষ্ণকালো কর্কশ মেঘস্তূপগুলি, মনে হয় যেন তারা সুমির প্রিয় কদমগাছটিকেই কুর্নিশ জানাতে জানাতে ভেসে চলেছে।

বাঙালির শীত যাপন

দেবযানী ভট্টাচার্য

এখানে শীত আসে পরিযায়ী পাখির ডানায় ভর করে, এখানে শীত আসে কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে, ঘাসের ডগায় শিশিরের উজ্জ্বলতায়, রঙিন ফুলের সৌরভে, খেজুরের রসে, পিঠে পায়েসের ম-ম গন্ধে, মায়ের শালের ফুলকারি কাজে, বাবার মাফলারে, টুপিতে ভর করে। কাশ্মীরী শালওয়ালার পিঠে ভর করে আসে উষ্ণতা।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ! শীতও যেন এক পার্বণের মতো বাঙালির হৃদয়ে উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই ক্ষণস্থায়ী শীত সারা বছরের ক্লান্তি দূর করে খানিক বাঁচার উৎসাহ দিয়ে যায়।

বাঙালির শীত যাপন আজকাল বেশ রঙিন, উৎসবমুখর, দিকে দিকে মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন উৎসব, মেলা। ঘরকুনো বাঙালির বদনাম ঘুচিয়ে সোয়েটার চাদরে নিজেকে মুড়িয়ে বাঙালি সেই উৎসবে নিজেকে সামিল করে। একটু উষ্ণতার খোঁজে বনভোজনে আনন্দে মেতে ওঠে সে। শীত যে শুধুই জরা, ফুরিয়ে যাওয়া, ঝরে পড়ার বার্তা নিয়ে আসে তা নয়; হৃদয়ে খানিক রঙের ঝিলিক দিয়ে যায়, পুরনো প্রেমিকের মতো হটাৎ যেন দগ্ধ জীবনে শীতল হাওয়া বুলিয়ে দিয়ে যায়।

বাঙালির হেঁসেল থেকেও ভেসে আসে সুগন্ধ- মা, ঠাকুমার খুন্তিতে ওঠে বোল; পিৎজা-বার্গারে অভ্যস্ত বাঙালির জিভ খুঁজে নেয় পিঠে পায়েসের স্বাদ। মনও যেন খানিক নস্টালজিক হয়ে ওঠে, স্মৃতিতে ছলকে ওঠে শীতের ছুটিতে দেশের বাড়ি ভ্রমণের পুরনো স্মৃতি, স্মৃতি ফিরিয়ে দেয় শৈশবের কিছু হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের উষ্ণতা।

আমাদের শীত যাপন হয়ে ওঠে সার্বিক অর্থে উৎসবময়, যেন যেটুকু জীবন ফিরে পাই, সে টুকুর স্বাদেই জীবন হয়ে ওঠে উৎসবময়। একটু হলেও মনে জেগে থাকে ভয়! এই বুঝি ফুরিয়ে যাবে এই আবেশ, এই রং, এই রোদেলা দুপুরে পিঠ পেতে বসে থাকা! আবার আমরা হয়ে উঠবো রুক্ষ, বর্ণহীন, তাই আমলকীর ডালে শীতের হাওয়ার নাচন দেখে জীবন খুঁজে পেতে চায় আবার নিজেকে। পৌষ ডাক দিয়ে যায়, মাঘের হৃদয় থেকে খসে পড়ে দু-এক ফোঁটা শিশির, হৃদয়ে সে আবেশ মেখে ভ্রমণপিপাসু বাঙালি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্র সৈকতে দু-ফোঁটা শান্তির খোঁজে, জীবনকে উৎসবময় করে তুলতে। কোন ঋতু আর বাঙালির যাপনকে এমন চঞ্চল, রঙিন করে তোলে? বাঙালির শীত যাপন তাই বরাবরই রঙিন উৎসবময়।

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক

মোঃ আবু ইউসুফ
(প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা)

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের প্রতি কীরকম শ্রদ্ধা দেখাবেন? একজন শিক্ষক ছাত্রদের সাথে কেমন আচরণ করবেন যাতে ছাত্ররা তার সঙ্গে সম্পর্কের সীমারেখা অতিক্রম করতে না পারে- সে বিষয়ে কোন নীতিমালা নেই। একজন শিক্ষক যখন ছাত্রদের গতানুগতিক কাজকর্মে বাঁধা দিয়ে থাকেন তখন ছাত্রদের এক অংশের মূল উদ্দেশ্য এটা হয়ে দাঁড়ায় যে কীভাবে সেই শিক্ষককে হেনস্তা করা যায়।

তাহলে কেন ছাত্র-ছাত্রীরা গতানুগতিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে তার উৎস খোঁজা দরকার-

প্রথমত, বর্তমান যুগে ইন্টারনেটের বিস্তর প্রসার ঘটেছে। এই সোসাল মিডিয়ার যুগে একজন ছাত্র যতটুকু সময় পড়াশোনার পিছনে ব্যয় করে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে ইন্টারনেটের মধ্যে, আর সেখান থেকে সে কিছু ভালোর সাথে আর যা যা অর্জন করে তার একটি তালিকা এরকম হতে পারেঃ

১. বিভিন্ন সিনেমার শর্ট স্ক্রিন গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখে, ও তাতে মশগুল থাকে। অবাস্তবকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কথা ভাবে।

২. টিকটক ব্যাধিতে আসক্ত হলে তার ঔষধ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

৩. ইউটিউব এর সুড়সুড়িমূলক ভিডিও যা কিশোরদের মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে রাখে।

৪. সোসাল মিডিয়ায় ছবি আপলোড, লাইক, কমেন্ট, বিচার-বিশ্লেষণ, অবান্তর কন্টেন্ট ইত্যাদিতে নিমগ্ন হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো যখন আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোররা দেখে তখন তারা নিজেদের জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করতে চায়। সিনেমার অবাস্তব কাহিনির মতো নিজের জীবনকে সাজাতে চায়। এগুলো দেখতে দেখতে তাদের ব্রেইন-ওয়াশ হয়ে যায় এবং তারা অস্থিরতার মধ্যে অবস্থান করে।

ফলাফল, পড়াশোনা থেকে দূরে সরে যাওয়া, মা-বাবার কথা মানতে রাজি না হওয়া ইত্যাদি। শিক্ষকদের পাঠদান তার ভালো লাগে না, মেজাজ খিটখিটে থাকে বলে কারও কথা শুনতে চায় না।

শিক্ষক তো পরম অভিভাবক; তিনি চান ছাত্র-ছাত্রীরা যেন পড়াশোনায় মনোযোগী হয়; সেই জন্য তাঁরা তাগিদ দিতে থাকেন।

ছাত্ররা তখন তাকে আর ভালো চোখে দেখে না। অভিভাবকদের কাছে যখন শিক্ষকরা নালিশ করে অথবা নোটিশ পাঠান তখন ছাত্ররা তেলেবেগুনে জ্বলে এবং শিক্ষকদের উপর চড়াও হতে চায়।

টিকটকের মতো মারাত্মক ব্যাধি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে কি না আমার জানা নেই। সেখানকার সিংহভাগ পারফর্মার শিক্ষার্থী; এই বিষয়টি এই প্রজন্মের জন্য হুমকি। কিশোর-কিশোরীরা অশ্লীল অবস্থায় টিকটক করছেন। তাদের বাবা-মা বুঝে উঠতে পারছেন না কী হওয়া উচিৎ, কী হওয়া উচিৎ নয়। এখানে যেহেতু আত্মমর্যাদা, মূল্যবোধ, শ্রদ্ধাবোধ এগুলো পরিবারের মধ্যেই উঠে যাচ্ছে, সেখানে শিক্ষক সে তো বহুদূর।

তাই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে এমন বিষয় রাখা দরকার যা আমাদের মূল্যবোধ শেখায় যেমন ছাত্রশিক্ষক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক, শ্রদ্ধাবোধ, মানবিক ও নৈতিক গুনাবলি অর্জন ইত্যাদি বিষয়গুলি।

সর্বোপরি, বাস্তব কর্মমুখী শিক্ষা সম্পর্কে বলা। কীভাবে মানুষের মতো মানুষ হওয়া যায় তা বিখ্যাত ব্যাক্তিদের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো।

আমরা এগুলো করি না। আমাদের দরকার যে ভাবেই হোক ভালো রেজাল্ট; মানুষ হওয়ার দরকার নেই । একজন পীরকে যেইভাবে তার সাগরিদ সব কিছু পাওয়ার জন্য তার সর্বস্ব দিয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান দেখান একজন ছাত্রের মানুষের মতো মানুষ হতে হলে তাই করা উচিত।

উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত নতুন পাঠ্যবইয়ের মধ্যে আমরা এমন কিছু রাখতে পারি যা ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক গুণাবলি অর্জন ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে সহায়তা করে ও শিক্ষকের মর্যাদা দিতে শেখায়।

। আবার দেখা হবে।

আপনাদের শুভেচ্ছা শাদ্বলের চলার পথের পাথেয় হোক

SHADWAL PATRIKA

EDITOR: NRIPENDRA NARAYAN BHATTACHARYA

COVER DESIGNING: SHAMSUL HOQUE AZAD

SHIBJAGNA ROAD

KHAGRABARI

COOCHBEHAR

শাদ্বল হোয়াটসঅ্যাপ নংঃ ৯৫৬৪৬৩২৪০৭

শাদ্বল ই-মেলঃ shadwalpatrika@yahoo.com

সমাপ্ত